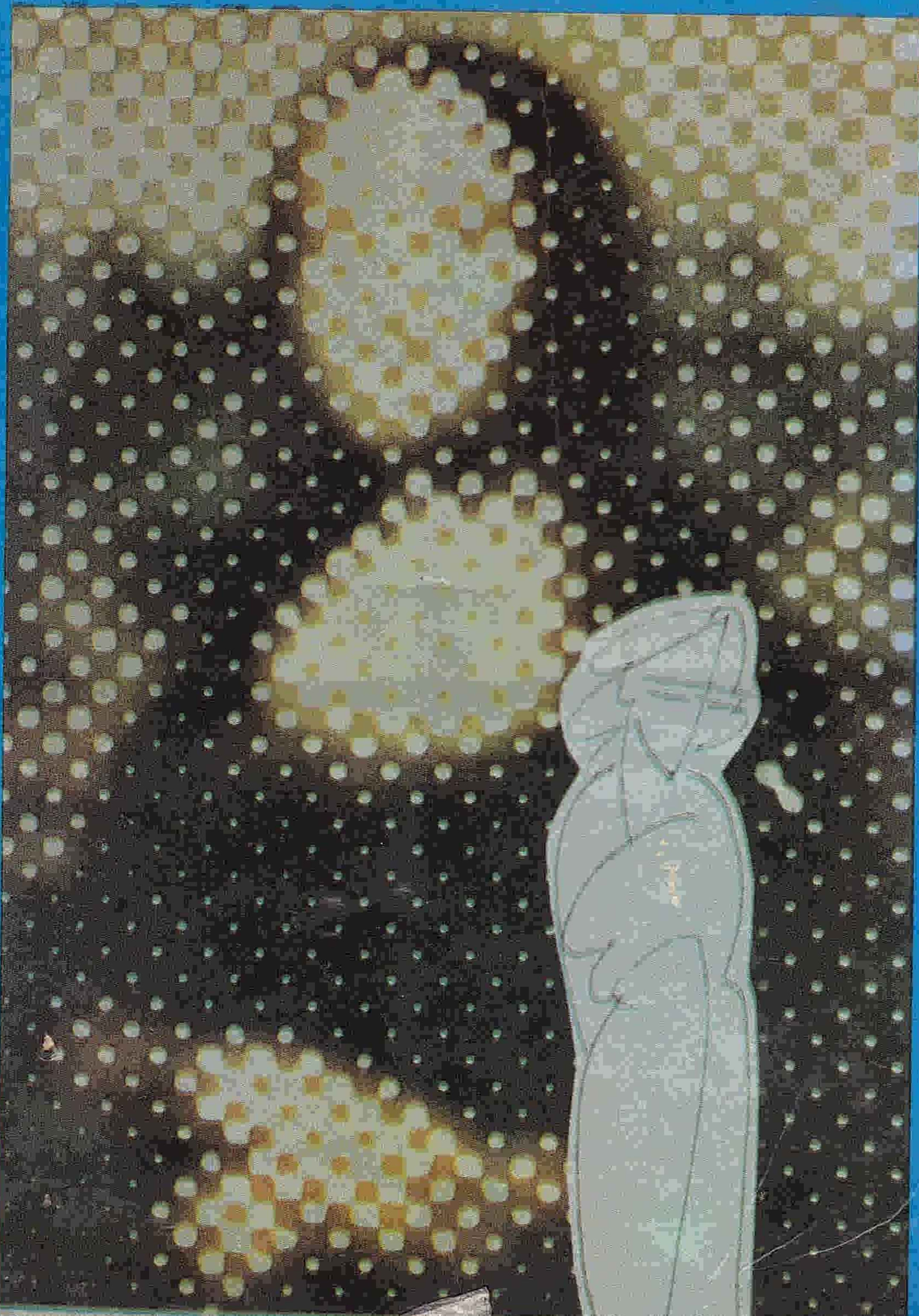
মোনালিসার শেষ রাত

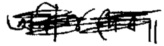
অনীশ দেব





কয়েকটি কথা

'মোনালিসার শেষ রাত' উপন্যাসটি বাংলাদেশে প্রকাশিত হল। এর জন্য 'অনির্বাণ' এর মাননীয়া তাছনীম আহমদকে ধন্যবাদ জানাই। তাই উপন্যাসের সমস্ত ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক। তবে পটভূমি পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা শহর। বইটির বিভিন্ন অধ্যায়ের শিরোনাম হিসেবে কলকাতার কয়েকটি বিখ্যাত রাস্তার নাম ব্যবহার করেছি। এর মধ্যে শুধুমাত্র 'আকাশ পাতাল রোড' নামটি কাল্পনিক। উপন্যাসটি পড়লেই পাঠক এর কারণ বুঝতে পারবেন।



এক ☐ সদর স্ট্রীট

যদি আপনাকে আকস্মিকভাবে কেতাবী ঢঙে প্রশ্ন করা হয় 'আর্তচিৎকার কয় প্রকার ও কি কি?' আপনি হয়তো কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিত থেকে একটু হেসে জবাব দেবেন, 'মোটামুটি ভাবে দু-রকম। ভয়ার্ত চিৎকার ও কামার্ত চিৎকার।' মোটে দু'রকম কেন? কারণ ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত কিংবা শীতার্ত ব্যক্তি কখনও চিৎকার করে না।

সুতরাং এইমাত্র যে চিৎকারটা আমার কানে এসেছে, সেটা হয় ভয়ার্ত কিংবা কামার্ত কোন মহিলার। এবং আমার উনত্রিশ বছর বয়েসের বিদ্যা-বুদ্ধি অভিজ্ঞতার সঙ্গে নারীচরিত্র যোগ করলে বলা যেতে পারে, এই মহিলা ভয়ার্ত। বিপদগ্রস্ত। প্রচণ্ডভাবে সাহায্যপ্রার্থিনী।

সন্ধ্যে সাতটায় সদর স্ট্রীটের জনহীনতা 'হিন্দুস্তান ইয়ার বুক' -এ স্থান পাওয়ার মত; আর রাত দশটা বাজলে 'গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস্'- এর ডাক পড়বে। এই মুহূর্তে সে ডাক পড়েছে। কারণ আমার হাতঘড়িতে এখন দশটা পাঁচ।

শরীরে বীর-রস উজ্জীবিত হল এবং আমি চৌরঙ্গী রোড ছেড়ে গাড়ি ঘুরিয়ে ঢুকে পড়লাম সদর স্ট্রীটের অন্ধকার হাঁ-এর মধ্যে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, গাড়িতে আমরা মাত্র দুজন: আমি ও আমার ০.৩৮ পুলিশ স্পেশাল। যদিও আমি পুলিশ নই।

গাড়ির হেডলাইটের আলোয় অসহায় মেয়েটি ও ধস্তাধস্তিরত দুটো লোক সরাসরি প্রকাশিত হয়ে পড়ল, এবং লোক দুজন পরবর্তী কর্মপন্থা ঠিক করে ওঠার আগেই আমি বিরাট যান্ত্রিক শব্দ তুলে ওদের শরীর ঘেঁষে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিয়েছি, নেমে পড়েছি গাড়ি থেকে- আমরা দুজনেই। তারপর ওদের মুখোমুখি হয়েছি।

মেয়েটি টাল সামলাতে না পেরে রাস্তায় পড়ে গিয়েছিল; এখন উঠে দাঁড়িয়ে কাপড়চোপড় গোছগাছ করে নিচ্ছে। হেডলাইটের বৃত্তের বাইরে থাকায় ওকে ঠিক ভাল করে দেখে উঠতে পারলাম না। তবে সাময়িকভাবে হতচকিত হয়ে পড়া লোকদুটো চোখ কুঁচকে আমাকে দেখতে চেষ্টা করছে। একটু বেপরোয়া ভাব। দুজনের মধ্যে একজনের মুখে বসন্তের দাগ নিবিড় চাষ করেছে। সম্ভবত এর নাম বসন্ত বাহার। আর দ্বিতীয়জনের মুখের চেহারা অ্যালসেশিয়ান ও বুলডগের

মাঝামাঝি। এবং নাম হয়তো জিমি।

বসন্ত ও জিমির কাছাকাছি গিয়ে আমি শান্তস্বরে জানতে চাইলাম, 'এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে কোন দরকার আছে?'

আড়চোখে লক্ষ্য করেছি, মেয়েটি ইতিমধ্যে আমার পেছনে, গাড়ির দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। যেন হঠাৎই গাড়িতে উঠে চম্পট দেবে।

গাড়ির হেডলাইটের জন্যে আমার মুখে হয়তো আলো আঁধারির সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ আমার স্বর শুনেই বসন্ত-বাহার চমকে উঠল। জিমির দিকে একপলক তাকিয়ে বলল, 'মাফ কিজিয়েগা, এস-আই সাব, ভুল হয়ে গেছে।'

'এস-আই' শব্দটা শুনে জিমির শরীর তড়িৎস্পৃষ্টের মতো কেঁপে উঠল। চকিতে কপালে হাত ঠেকিয়ে বসন্তকে ফেলে রেখেই দ্রুতপায়ে হাঁটতে শুরু করল ফ্রি-স্কুল স্ট্রীট অভিমুখে। বসন্ত আমার হাতের ০.৩৮ পুলিশ স্পেশালের দিকে নিথর চোখে তাকিয়ে রইল।

কয়েকটা শঙ্কাশিহর মুহূর্ত পার হয়ে যায়। আমি সহজ স্বাভাবিক স্বরে বললাম,'চলো– মাফ কিয়া–'

লক্ষ্য করলাম, এই প্রাক-বসন্তের হাওয়াতেও বসন্তের মুখে ঘাম ফুটে উঠেছে। ও প্রভুভক্ত কুকুরের মতো মাথা ঝুঁকিয়ে ঘনঘন সেলাম জানাল আমাকে। তারপর মিউজিয়ামের ফুটপাথ ধরে অন্ধকারের বুকে মিলিয়ে গেল।

আমি হাসলাম মনে মনে। পুলিশের চাকরি ছেড়েছি প্রায় পাঁচ মাস, কিন্তু আমার 'সুনাম' এতটুকু কমে নি। এই এলাকার লোকেরা এখনও জানে এস-আই সম্রাট সেন হাসতে হাসতে ট্রিগারে চাপ দেয়। এবং তার আগে হিন্দি ছবির মতো কখনও ভয় দেখায় না, শাসায় না, রিভলবার উঁচিয়ে ধমক দেয় না। এই কিংবদন্তীর জন্ম হয়েছে বছর দুয়েক আগে এমনি এক অন্ধকার রাতে .... তখন আমি পার্ক স্ট্রীট থানায় সত্যিকারের এস-আই ....

মার্কুইস স্ট্রীট দিয়ে হেঁটে থানায় ফিরছিলাম। কারণ লিণ্ডসে স্ট্রীটে জীপটা হঠাৎ বিগড়ে গিয়েছিল। যমুনা সিনেমা হলের কাছাকাছি আসতেই দুটো কালো ছায়া বিশাল থেকে বিশালতর হয়ে আমার পথ আগলে দাঁড়াল। একজনের ডান হাতে একটা মোটা লোহার রড, দ্বিতীয়জন জামার তলায় হাতটা মুঠো করে রেখেছে – হাতে কি আছে কে জানে। আমি 'কি চাই?' জাতীয় কিছু একটা প্রশ্ন করে ওঠার আগেই লোহার রড দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠেছে 'শালা রাজুকে সাজা লাগিয়েছিস'—

রাজু ওরফে গোলাম হোসেন দিন সাতেক আগে সাজা হয়ে যাওয়া এক স্মাগলার। ওর দেওয়া ঘুষের টাকা অস্বীকার করে আমিই ওকে হাজতে এনে

পুরেছি। এরকমটা নাকি এই এলাকায় আগে কখনও হয় নি। গোলাম হোসেন বারবারই বলেছিল, 'সাব, আপনি লাইনে নয়া আছেন, ভীষণ ভুল করলেন কিন্তু–'

এখন বুঝতে পারছি রাজুর সেই কথার ইঙ্গিত।

আন্তরিক সিদ্ধান্ত নিতে যেটুকু সময় লেগেছে। তারপর আর একটা মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে আমি প্রথম গুলিটা করেছি লোহার রডের ডান হাতে, এবং দ্বিতীয়টা দ্বিতীয়জনের পায়ে। যন্ত্রণার চেয়ে বিস্ময় ওদের তখন বোবা করে দিয়েছে। রক্ত-ঝরা পা ও হাতের দিকে তাকিয়ে ওরা তখনও বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না যে আমি সত্যিই গুলি চালিয়েছি– এতটুকু না জানান দিয়ে। প্রচণ্ড শব্দে আশে পাশে দু'চারজন করে লোকের ভিড় বাড়তে শুরু করেছে। ওরা দুজন লুটিয়ে পড়েছে রাস্তায়। ছটফট করছে। লোহার রডটা ও একটা রামপুরিয়া পাশাপাশি পড়ে আছে পথের উপর। নিষ্ক্রিয়, মৃত অবস্থায়। এবং সেই আমার সুনামের শুরু। তারপর থেকে ধীরে ধীরে সবাই নিচু মহলের সবাই— জেনে গেছে 'এস-আই সেন বহুৎ বুরা আদমী। বদরাগী। বিনা নোটিশে গুলি চালায়।' প্রসঙ্গত বলে রাখি, আমি খুব শান্ত প্রকৃতির মানুষ। এবং একই সঙ্গে কল্পনাবিলাসী। প্রতিপক্ষ আমাকে ভয় পায় কেন জানি না। হয়তো আমার অপ্রত্যাশিত আচরণের জন্য। যখন ওরা ভাবে আমি আক্রমণ করব, তখন আমি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিই। আর যখন ওরা বন্ধুত্বের কালো হাত বাড়িয়ে দেয়, আমি রগের ওপরে সপাটে বসিয়ে দিই পুলিশ স্পেশালের ভারী বাঁট। ওরা যেমন অবাক হয়, তেমন আমিও হই। কি করা উচিত, বা করব, এসব চিন্তা-ভাবনা না করে কাজ করে ফেলি আমি। সেই জন্যেই অনেকের কাছে আমি বোকা। যেমন এই মুহূর্তে বোকার মতো একটি অজানা – অচেনা যুবতীর বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়েছি।

সুতরাং, এই বদ অভ্যেসের জন্যে অল্প সময়ের মধ্যে অনেকবারই আমাকে বড় সাহেবের কাছে জবাবদিহি করতে হয়েছে, এবং শেষ পর্যন্ত স্বস্তির জন্য পুলিশের চাকরিটা ছাড়তে হয়েছে। তখনই আমি এ-বি-সি প্রোটেকশন নামক সিকিওরিটি কোম্পানিতে যোগ দেই।

এ-বি-সি প্রোটেকশন বিদেশী ঠাট-ঠমকে তৈরি, যদিও বেশির ভাগ কর্মচারীই বাঙালি। কোম্পানির কাজ বড়লোক মক্কেলদের দামী জিনিসপত্র নিরাপদে আগলে রাখা— প্রধানত। এছাড়া সাধারণ দোকানপাটও আমরা পাহারা দিয়ে থাকি। পার্ক স্ট্রীট ও ক্যামাক স্ট্রীট মিলিয়ে প্রায় বাইশটা দোকান আমাদের তত্ত্বাবধানে আছে। আর প্রয়োজন হলে মানুষজনকেও বিপদে-আপদে রক্ষা করে থাকি– তবে অবশ্যই উপযুক্ত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে -আইনসম্মত ব্যবস্থা নিয়ে।

এই পাঁচ মাস এ-বি-সি'তে থেকে– আমরা সংক্ষেপে নিজেদের কোম্পানিকে

ওই নামে ডাকি –আমার অন্যের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ার বদঅভ্যেস প্রায় পাঁচ গুণ বেড়ে গেছে। এমন কি পারিশ্রমিকের প্রলোভন না থাকলেও। যেমন এখন।

দুঃসাহসে এগিয়ে আসা নৃশংস দুটো শয়তানকে চোখের পলকে সাধু বনে গিয়ে দু'পায়ের ফাঁকে লেজ ঢুকিয়ে পালাতে দেখে সাদার ওপরে সবুজ বুটির কাজ করা শিফন শাড়ি পরিহিতা বিপদগ্রস্তা যার –পর–নাই বিস্মিত ও আশঙ্কিত। বিস্ময়ের কারণ সহজেই অনুমান করা যায়, কিন্তু আশঙ্কার কারণ, আমি এখন ওর দিকে তাকিয়ে সরল আন্তরিকভাবে হাসছি। হেডলাইটের আলো আমার চোয়াড়ে গাল, পুরু গোঁফ ও আপাতদৃষ্টিতে অপাপবিদ্ধ চোখ–মুখ ভাসিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু নায়িকা এখনও আলো–আঁধারিতে দাঁড়িয়ে। রহস্যময়ী।

ওর দিকে কয়েক পা এগোতেই আমার খেয়াল হল বাঁ হাতের মুঠোয় বিশ্রীভাবে ধরে থাকা বিশ্রী রিভলবারটার কথা। চকিতে ওটাকে শোল্ডার হোলস্টারে ঢুকিয়ে দিলাম। তারপর ছোট্ট করে বললাম 'আপনার লাগে নি তো?'

'আপনি কি পুলিশের লোক?' পাল্টা সন্দিহান প্রশ্ন ছুটে এল আমার দিকে। তবে মানতেই হয়, মেয়েটির কণ্ঠস্বর এখন অনেক বেশি মোলায়েম। ছন্দময়।

উত্তর দেবার আগে চারপাশে নজর বুলিয়ে দেখি, সামান্য দূর থেকে দুজন রিক্সাওয়ালা ও জনৈক ফুটপাথবাসী রীতিমত কৌতূহলী চোখে আমাদের দেখছে। সুতরাং যেহেতু মেয়েটির কাছ থেকে দ্বিতীয় কোন আর্তচিৎকার আমি শুনতে চাই না, জবাব দিলাম, 'হ্যাঁ, পুলিশের লোক। এস আই– পার্ক স্ট্রীট থানা।' মুখে 'অশ্বত্থামা হত'টুকু বলে মনে মনে উচ্চারণ করলাম, 'পাঁচ মাস আগে ছিলাম।'

গাড়ির দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'আসুন– উঠে বসুন গাড়িতে–' সামনের দরজাটা খোলাই ছিল, ইশারায় ওকে নির্দেশ করলাম।

ও একবার তাকাল আমার মুখে। সন্দেহের ছায়াটা কেটে এসেছে কি না ঠিক বুঝতে পারলাম না। তারপর 'যা হয়–হবে' গোছের একটা মুখভাব করে উঠে বসল গাড়িতে। আমি নিজের আসনে স্টিয়ারিং ধরে বসলাম। স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে নিলাম চৌরঙ্গী রোডের দিকে।

মেয়েটি কোন স্থাপত্য–শিল্পের মতো গাড়ির সীটে থিতু হয়ে বসলেও ওর চোখ কাঠবেড়ালির মতো এদিক – ওদিক ঘুরছে। বোধ হয় আঁধারি রাস্তায় কাউকে খুঁজতে চাইছে। কিন্তু কেন? গাড়ি চলতে শুরু করতেই আমি প্রশ্নটা করলাম, 'কাউকে খুঁজছেন?'

ও ভীষণভাবে চমকে উঠল। ঠোঁট চিরে অর্ধস্ফুট একটা শব্দও বেরিয়ে এল। কিন্তু পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'উহু, না তো।'

ওর কথা শেষ হতে না হতে একটা মোটামুটি অবাক কাণ্ড ঘটল। সদর স্ট্রীটের

অন্ধকার পেট চিরে তীব্র গতিতে একটা গাড়ি ছুটে এল। হেডলাইট নতুন ব্যাটারিতে দাউ দাউ করে জ্বলছে। হাওয়ায় সোঁ সোঁ শব্দ তুলে আমার ছাই রঙা মরিস–মাইনরকে পাশ কাটিয়ে পলকে বেরিয়ে গেল গাড়িটা। মেয়েটি মুহূর্তে যেন সিঁটিয়ে গেল। অভিব্যক্তিতে এখন স্বস্তি ও ভয় যমজ ভাইয়ের মতো গলাগলি করে রয়েছে। স্বস্তির কারণ হয়তো, এই সেই হারানিধি–যাকে ওর চোখ লুকিয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছিল এবং ভয়, হারানিধিকে আমি দেখে ফেলেছি বলে। আমি কিন্তু ওকে কোন প্রশ্ন করলাম না।

যে গাড়িটা আমাকে পাশ কাটিয়ে ছুটে গেল, ওই অল্প সময়েই আমি তার কতগুলো তথ্য মনে মনে টুকে নিয়েছি। এক. গাড়িটা একটা সবুজ বা নীল, ঠিক ঠাহর করতে পারি নি, অ্যাম্বাসাডার। দুই. চালাচ্ছেন জনৈক পুরুষ। তিন. গাড়িটা চৌরঙ্গীতে পড়ে উত্তরমুখী হল। চার. লাল রঙা টেল–লাইটের একটা ভাঙা। এবং শেষ তথ্য. গাড়ির নম্বরটা আমি দেখে উঠতে পারি নি।

পরবর্তী ক্রিয়ার বশবর্তী হয়ে আমি ব্রেক কষে মিউজিয়ামের গা ঘেঁষে আমার মরিস দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলাম, এখন আবার চালু করলাম। হালকা গলায় প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলাম বাতাসে, 'কোনদিকে যাব? ডান দিক, না বাঁ দিক?'

ছোট্ট করে উত্তর এল, 'বাঁ দিক। আমার বাড়ি মিডলটন রো– তে।'

উত্তর শুনে এটুকু বোঝা যায়, আমি অনামিকার আস্থা অর্জন করেছি, কারণ ও ধরেই নিয়েছে আমি ওকে বাড়ি পর্যন্ত নিরাপদে পৌঁছে দেব। সত্যিই তাই দেব। ও না বললেও দিতাম।

বড় রাস্তায় কিছুক্ষণ গাড়ি চালাতেই সারি বেঁধে পিছলে যাওয়া বিক্ষিপ্ত আলোয় ওকে দেখতে চেষ্টা করলাম। মুখের আদলটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। লম্বাটে মুখ। নাকটা টিকলো, তার ডগায় ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমেছে। গায়ের রঙ ফর্সা এবং শাড়িটা এক কথায় অসামান্য মানিয়েছে। শ্বাস–প্রশ্বাস যে স্বাভাবিকের চেয়ে এখনও সামান্য দ্রুততর, তা শাড়ি–ব্লাউজের অলস কাঁপুনি দেখে আঁচ করা যায়।

পার্ক স্ট্রীটে বাঁক নিতেই আলোর পরিমাণ ও সংখ্যা, দুই–ই বেড়ে গেল। অনামিকা আরও প্রকাশিত হল আমার চোখে। এবার বিনা দ্বিধায় প্রশ্ন করলাম, 'আপনার নামটা জানতে পারি?'

'মোনালিসা। মোনালিসা চৌধুরী।' দা ভিঞ্চির মানসকন্যার চোখ জানলা দিয়ে অপসৃয়মান পার্ক হোটেলের দিকে নিবদ্ধ। আমার আশা নিহত হল। ও মুখ ফিরিয়ে তাকাল না আমার দিকে। কিন্তু কণ্ঠস্বর উদাহরণবিহীন। সেতার অথবা তানপুরায় এই সুরেলা সঙ্গীত ধরা পড়ে না।

'অত রাতে সদর স্ট্রীট ধরে আসছিলেন?'

অন্য সময় অন্য কাউকে এ জাতীয় প্রশ্ন করলে 'নিজের চরকায় তেল দিন' **জাতীয়** উত্তর শোনার জন্য কানকে আগে থাকতেই তৈরি করে রাখতাম, কিন্তু এখন **স্থান**-কাল-পাত্রী আলাদা। আর আমার পরিচয় এস-আই। সুতরাং উত্তর পেলাম।

মোনালিসা একটু ইতস্তত করে নিচু গলায় বলল, 'সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। ভাল লাগছিল না, তাই শেষ হওয়ার আগেই উঠে এসেছি।'

মিষ্টি স্বরে আমার নেশা ধরে যায়। কাণ্ডজ্ঞানহীনতা জাঁকিয়ে বসে আমার অভ্যন্তরে। তার ওপর রাতের দুরন্ত হাওয়ায় কারো এলোমেলো চুল, সুরভির সুবাস আমাকে উদভ্রান্ত করার পক্ষে যথেষ্ট। শুধু বলতে ইচ্ছে করে, 'চাঁদ-তারা, তোমরা সাক্ষী থাকো। দেখো, কি দুর্লভ রাত উপহার পেয়েছে সম্রাট সেন।' আর একই সঙ্গে অবাধ্য কল্পনা নির্লজ্জভাবে তার অগ্রগতি শুরু করে দিয়েছে আমার মনে। হাজার চেষ্টাতেও তার রথের কেশর ফোলানো ঘোড়াগুলোকে আমি রুখতে পারছি না।

যদি এমন হত, মোনালিসা আমার অনেক পরিচিত, ওকে নিয়ে আমি নৈশ কলকাতা ভ্রমণে বেরিয়েছি, ও আমাকে ....

'ডান দিকে।' হালকা অথচ সংক্ষিপ্ত কথাটা আমাকে বাস্তবে নিয়ে এল। যেন হঠাৎই আছড়ে পড়েছি বরফ-জলে। অতএব সম্রাট সেন সচেতন হল। এবং গাড়ি ঘোরালাম নির্দেশ মতো। মিডলটন রো'তে এসে আলো সংক্ষিপ্ত ও আঁধারি ঘন হল।

মোনালিসা চুপচাপ। অথচ আমার কত কিছুই বলতে ইচ্ছে করছে। হয়তো মেয়েদের প্রতি আমার এই সর্বজনীন মনোভাব জানাজানি হওয়ার ফলেই অফিসের বন্ধুরা বলে, 'মেয়ে দেখলেই সম্রাট হারেম তৈরির স্বপ্ন দেখে।' ওদের দোষ নেই। আমাকে ওরা বোঝে না।

মোনালিসার সংক্ষিপ্ত নির্দেশ আবার শোনা যেতেই, রাস্তার বাঁ দিক ঘেঁষে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিয়েছি আমি।

ও নামল। আমিও। এতক্ষণে ও পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। ওকে এখন অনেক স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। নিখুঁত ভুরু, টানা চোখ, দু-চোখের মাঝে কালো টিপ যেন সৌন্দর্য সৃষ্টির গোপন রহস্যের শেষ চাবিকাঠি। আমার নিষ্পাপ মুগ্ধ চাউনিতে বিব্রতবোধ করল মোনালিসা। চোখ সরিয়ে রাস্তার দুপাশে দেখল। বলল, 'সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ ইন্সপেক্টর।' তারপর মাথা তুলে সামনের বাড়িটার চারতলার একটা ফ্ল্যাটের দিকে তাকাল, 'গুড নাইট।'

আমি হঠাৎই যেন চমকে উঠলাম। ও চলে যাচ্ছে। সরে দাঁড়াচ্ছে আমার নিঃসঙ্গ জীবন থেকে। যেমন অতর্কিতে এসেছে, তেমনি অতর্কিতে বিদায় নিচ্ছে। সুতরাং খড়কুটো আঁকড়ে ধরতে চাইলাম লজ্জাহীন ভাবে। বললাম, 'যদি আপনার আপত্তি

না থাকে, তাহলে আপনাকে ঘরের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে চাই।'

ও ইতস্তত করছে। আরও বললাম, 'নইলে স্বস্তি পাব না।'

ছোট্ট করে হাসল। একরাশ মণি-মুক্তো ঝরে পড়ল অবহেলায়। ছড়িয়ে গেল ছত্রখান হয়ে। আর আমি লোভী জহুরীর মতো সেগুলো একে একে কুড়িয়ে নিতে লাগলাম। সঞ্চয় করে নিলাম নিটোল অনুপম আকাঙ্ক্ষায়।

মোনালিসা বলল, 'বেশ, চলুন।'

বাড়িটা বাইরে থেকে সেকেলে মনে হয়। কারণ সত্যিই সেকেলে। বিশাল কাঠের দরজা। চওড়া ধাপের সিঁড়ি। সিঁড়ির একপাশে আট-দশটা ডাকবাক্স। আলোর পরিমাণ মোটামুটি। আমার সামনে হাইহীলের খটখট সতর্কবাণী, এবং তার পেছনেই সন্ত্রস্ত ভীতু পায়ে আমি অনুসারী। তখনই প্রমাণ পেলাম, বাড়ির অভ্যন্তর নিয়মমাফিক বিবর্তনে যথেষ্ট আধুনিক হওয়ার সুযোগ পেয়েছে।

একতলা, দোতলা করে একে একে সিঁড়ির ধাপ পেরিয়ে আমরা এসে থেমেছি চারতলায়। একটাই ফ্ল্যাট এবং তার হালকা নীল দরজা বন্ধ। দরজার পাশেই চারটে ছোট ছোট টবে শুকনো গাছ সাজিয়ে রাখা হয়েছে। মোনালিসা দরজার কাছে থমকালো। এখানে আলো অনেক বেশি উজ্জ্বল। ফলে দা ভিন্সির মানসকন্যাও। ওকে ভীষণ ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করছে। আর তখনই ও হাসল। বলল, 'এবার নিশ্চিন্ত আর খুশি তো?'

হাসলাম আমিও। কারণ সংক্রামক ব্যাধি আমার খুব প্রিয়। বললাম, 'খুশি। তবে রাত-বিরেতে ওভাবে একা বেরোবেন না। কারণ সব দিন হয়তো পার্ক স্ট্রীট থানার এস-আই, এই সম্রাট সেন হাজির থাকতে পারবে না।'

ছোট্ট কালো একটা ব্যাগ, যেটা এতক্ষণ নজরে পড়ে নি, খুলে একটা চাবি বের করল ও। মুখ তুলে তাকাল, 'আগে থেকে খবর দিলে হাজির থাকতে পারবেন নিশ্চয়ই?'

অপ্রত্যাশিত। অথচ আকাঙ্ক্ষিত। বললাম, 'বাই অল মীন্স্।'

লক্ষ্য করলাম, সদর স্ট্রীটের ঘটনায় কোন যুবতী মেয়ের যতটা বিচলিত হওয়া উচিত, ততটা বিচলিত ও হয় নি। কারণ আমি জানি না। নিশ্চল দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম ওর কার্যকলাপ। যেন কোন রুপোলি পর্দায় ছবি দেখছি। ও চাবি ঘুরিয়ে লক খুলল। তারপর দরজার নব ঘুরিয়ে চাপ দিল। এবং অত্যাশ্চর্য ঘটনাটা লক্ষ্য করলাম তখনই।

দরজা খুলল না।

এই ঘটনায় আমার আশ্চর্য হওয়ার কথা নয়। কারণ মাথায় সিঁদুরের রেখা অনুপস্থিত থাকার অর্থ এই নয় যে মোনালিসা চৌধুরী কুমারী, অবিবাহিতা,

স্বজনবিহীন ও একা। আমি আসলে অবাক হয়েছি মোনালিসার অভিব্যক্তি দেখে। কারণ ও স্পষ্টই আশা করেছিল দরজা খুলবে এবং কার্যত সেটা না ঘটতে দেখে বেশ হতবাক হয়েছে।

আমি সাহায্যের ভঙ্গিতে সামনে এক পা এগোতেই দরজায় পিঠ দিয়ে বাধা দেবার ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়িয়েছে মোনালিসা। যেন আমি ওর গোপন কোন রহস্য আবিস্কার করে ফেলব। আমি থমকে দাঁড়ালাম। তখনই ও ভাবলেশহীন কঠিন মুখে বলল, 'গুড নাইট, ইন্সপেক্টর।'

বাধ্যতামূলক বিদায়ের ইঙ্গিত। অথচ রহস্যভেদের দুরন্ত ইচ্ছেয় আমার মন ছটফট করছে। তবু হাসলাম– কষ্টকৃত হাসি। বিদায় জানিয়ে নামতে শুরু করলাম সিঁড়ি বেয়ে। তিনতলার সিঁড়িতে বাঁক নিয়েই থমকে দাঁড়ালাম। আলো আঁধারিতে আত্মগোপন করে উৎকর্ণ হলাম।

শুনতে পেলাম, দরজায় নক করার শব্দ। মোনালিসা।

একটু পরে দরজা খোলার শব্দ। ঘরে কেউ ছিল।

'কি ব্যাপার, বাবি, তুমি?' মোনালিসা অবাক হয়ে প্রশ্ন করল।

উত্তরে একটা গম্ভীর স্বর শোনা গেল, 'নিশ্চয়ই কারণ আছে, তাই।'

এই স্বরে কঠোর আদেশ এবং তা পালিত-দেখতে-বরাবর– অভ্যস্ত সুর রাজত্ব করছে। কে এই আদেশকারী?

একটু পরে ভারী দরজা সশব্দে বন্ধ হওয়ার শব্দ শুনলাম।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আমি আবার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলাম। অতি সন্তর্পণে। দরজার খুব কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে আড়ি পাতলাম। অস্পষ্টভাবে শুনতে পাচ্ছি ঘরের কথাবার্তা। প্রথমে শুনলাম লোকটির কণ্ঠস্বর, 'সদর স্ট্রীটে কি ঝামেলা হয়েছিল?'

কিছুক্ষণ নীরবতার পর মোনালিসার অস্ফুট উত্তর, 'দুটো বাজে লোকের খপ্পরে পড়েছিলাম'—

'ও। সেই জন্যেই আমি ফ্ল্যাটে ফিরে এলাম আবার–' কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর, যে তোমায় বাঁচাল, সেই দেবদূতের পরিচয়টা জানতে পারি?' ব্যাঙ্গের তীব্রতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তীক্ষ্ণ হল ভারী কণ্ঠস্বর।

'বাবি, তোমার এসব ইয়ার্কি আমার ভাল লাগে না–'

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল মোনালিসা, কিন্তু তার আগেই অঘটনটা ঘটল। হঠাৎই শুনতে পেলাম সিঁড়ি বেয়ে একটা চঞ্চল পায়ের শব্দ উঠে আসছে। চারতলায়। চট করে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই আমার হাত ধাক্কা খেলো ফ্ল্যাটের বন্ধ দরজায়। শব্দ হল স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি। এবং ঘরের ভেতর কথোপকথন বন্ধ হল তৎক্ষণাৎ।

আমি সটান ছুট লাগালাম সিঁড়ির দিকে। ঝরের বেগে নামতে শুরু করলাম। কারণ পরের দরজায় আড়ি পাতার অপরাধে আমি ধরা পড়তে চাই না। কিন্তু তিনতলার সিঁড়ির দিকে বাঁক নিতেই ধাক্কা লাগল আগন্তুকের সঙ্গে। লোকটার চেহারা ছিপছিপে। চোখে ছিল হাই পাওয়ারের চশমা। ছিল, কারণ এখন সেটা দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়েছে সিঁড়ির ধাপে। আর লোকটা দেওয়ালের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করছে। একটা অর্ধস্ফুট গোঙানি ছাড়া আর কোন শব্দ তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে নি। তার দেওয়াল হাতড়ানোর ভঙ্গি দেখেই বুঝলাম, চশমা তার অন্ধের যষ্টি।

আমি থমকে দাঁড়িয়েছিলাম ওই একটা মুহূর্ত। তারপরেই অসমাপ্ত ঊর্ধ্বশ্বাস-দৌড় আবার শুরু করেছি। দোতলায় পৌঁছে শুনলাম, ক্ষীণজীবি লোকটার চিৎকার, 'চোর! চোর!'

রাস্তায় বেরিয়ে এসে হাসি পেল আমার। একটু আগের দেবদূত বর্তমানের চোর। শুধুমাত্র আচরণ ও পরিস্থিতির কারণে। আর দেরি না করে গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিলাম। উঁকি মেরে একবার দেখলাম চার তলার জানলার দিকে। ঘরে আলো এখনও জ্বলছে।

গাড়ি ঘুরিয়ে পার্ক স্ট্রীটে বেরিয়ে আসার মুহূর্তে মনে হল, একটা সবুজ অ্যাম্বাসাডারকে মোনালিসার বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। কিন্তু তখন আর সময় নষ্ট করার উপায় নেই। এখন আমাকে রাতের চক্কর শুরু করতে হবে। অল বার্গলারি অ্যাণ্ড ক্রাইম প্রোটেকশন– অর্থাৎ এ-বি-সি– আমাকে মাইনে দেয় এই কাজের জন্যেই। মোনালিসা চৌধুরীকে আমার উত্তাল প্রেমিকা কল্পনা করে স্বপ্নবিলাসে সময় কাটিয়ে দেবার জন্য নয়।

নির্জন রাস্তায় ছুটে চলার সময় কয়েকটা স্বাভাবিক এবং নিরীহ প্রশ্ন ক্রমাগত বিঁধে চলল আমার মনে। কে এই বাবি নামধারী লোকটি? বন্ধ ফ্ল্যাটে সে এসে ঢুকল কেমন করে? তার কাছে কি ডুপ্লিকেট চাবি ছিল? সদর স্ট্রীটে সবুজ অথবা নীল অ্যাম্বাসাডারে চালকের আসনে কে ছিল? বাবি? তার সঙ্গে মোনালিসার সম্পর্ক কি? আর সবশেষে, চারতলায় উঠে আসা যে লোকটির সঙ্গে আমি সংঘর্ষিত হলাম, সে কে? বাড়িটার চারতলায় একটিই মাত্র ফ্ল্যাট। মোনালিসা চৌধুরীর। তাহলে ওই রোগা লোকটিও কি মোনালিসার ফ্ল্যাটেই যাচ্ছিল?

জানি, কোন সুস্থ-মস্তিস্ক মানুষের মাথায় এরকম উদ্ভট প্রশ্নের মিছিল জন্ম নেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আমার মস্তিস্ক সুস্থ নয়। কারণ আমি প্রাক্তন পুলিশের লোক, আমি এ-বি-সি প্রোটেকশনের নাইট ওয়াচম্যান এবং আমি মোনালিসাকে ভালবেসে ফেলেছি। যদিও ওর মতো সুন্দরীকে মুহূর্তে ভালবেসে, ফেলাটা কোন

অস্বাভাবিক অথবা কৃতিত্বের কাজ নয়। আর সব শেষে, মনে পড়ছে জুনির কথা। ও বলত, সম্রাট, মেয়ে দেখলেই কি তোমার ভালবাসতে ইচ্ছে করে? তাহলে আমাকে শুধু শুধু–

ওকে আমি বলতে পারি নি, চিরটাকাল আমি একতরফাই ভালবেসে গেছি। কেউ আমাকে প্রতিদান দেয় নি। সেই প্রতি-ভালবাসা আমি চাইও না। আমার ভালবাসা স্বার্থপরতা মুক্ত। হয়তো সেই কারণেই আমি অসুস্থ মস্তিস্ক। সেই কারণেই, জুনি যখন আমাকে ছেড়ে চলে যায়, আমি বুক ভাসিয়ে কেঁদেছি। বলতে চেয়েছি, অশ্রু, তুমি মহান।

দুই ☐ মিশন রো

এ–বি–সি প্রোটেকশন।

'প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিওর' এর ঐতিহ্যে কোম্পানির সাইন–বোর্ডের এক চতুর্থাংশ জুড়ে মন্তব্য লেখা রয়েছে, 'প্রোটেকশন ইজ বেটার দ্যান সিওর।' এই শ্লেষধর্মী ক্যাপশনের আবিস্কর্তা আমাদের কোম্পানির খোদ মালিক কর্নেল বটব্যাল। আমাদের কাছে সংক্ষেপে 'সিবি'। এই আদরের ডাকের উত্তরে উনি প্রায়ই ঠাট্টা করে বলেন, 'সেন, যদি আমার নাম বীরেন চক্রবর্তী হত, তাহলে তোমাদের সংক্ষিপ্ত নাম আমি অ্যাকসেপ্ট করতাম না। ইউ নো দ্য রিজন।'

উত্তরে হাসাহাসি। সিবি কথায় কথায় খুব হাসেন। বোঝা যায়, ওর জীবনে দুঃখের স্মৃতির আকাল চলছে।

কাচের দরজা খুলে প্রথম মুখোমুখি হলাম সেই হাসিখুশি মানুষটার। আমাকে দেখেই জানতে চাইলেন, 'ও–কে?'

আমি সহজ হালকা গলায় জবাব দিলাম, 'এভরিথিং ও–কে।'

এই প্রশ্ন সিবির একেবারে নিয়মমাফিক হয়ে গেছে। কোম্পানির যারাই রাতের টহলে থাকে, তারা সকালে অফিস আসামাত্রই সিবির এই আন্তরিক প্রশ্নের মুখোমুখি হয়। সিবি পায়চারি করতে করতে রিসেপশনিষ্ট নমিতা বাসুকে ডিক্টেশান দিচ্ছিলেন। আমার সঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলাপচারি শেষ হতেই অসমাপ্ত কাজে মনোযোগ দিলেন। লক্ষ্য করলাম, নমিতা একটা নতুন শাড়ি পরে এসেছে –হয়তো এবারে পুজোয় কেনা।

আমাদের অফিসটা রাস্তার ওপর, একতলায়। সামনের ঘরটা বিশাল। তবে শুধুই প্রস্থে, গভীরতায় নয়। এই ঘরেই বসি দশজন। চারজন অপারেশান্স্ ডিপার্টমেন্টের। তিনজন ইনভেষ্টিগেশন্স। একজন অপারেশান ম্যানেজার ও বাকি দুজন ষ্টেনো টাইপিষ্ট। রিসেপশনের নমিতা বাসুকে হিসেবের বাইরে রেখেছি। ওর কর্মদক্ষতা অমানুষিক পর্যায়ে পড়ে, তাই।

ডান দিকের দরজা দিয়ে সামনের ঘর ডিঙিয়ে গেলেই মাঝারি মাপের তিনটে ঘর। একটা রেকর্ডস্ অ্যাণ্ড রেফারেন্স সেকশন। দ্বিতীয়টা আর্মস সেকশন। তৃতীয়টা

ম্যানেজিং ডিরেক্টর, অর্থাৎ সিবির ঘর। কোম্পানির যাবতীয় হিসেবপত্রের কাজ হয় আর-আর সেকশানেই। তাছাড়া আর্মস সেকশানের দায় দায়িত্ব যখন তখন নিজের কাঁধে তুলে নেন সিবি স্বয়ং। তাঁর মতে, অস্ত্রশস্ত্র ছেলেখেলার জিনিস নয়। কথাটা সত্যি।

আর্মস সেকশানে সরাসরি গেলাম রিভলবারটা জমা দিতে। সেকশন প্রহরী রামকৃপাল খাতাপত্র খুলে বসেছিল, আমাকে দেখেই হাত কপালে তুলল। আমি সবিনয়ে অভিবাদন গ্রহণ করে ০·৩৮ স্পেশালটা ওর হাতে দিলাম। ও চেম্বার খুলে প্রথমে পরীক্ষা করল সব ক'টা গুলিই ঠিকঠাক আছে কি না। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'সেন সাব, কাল তাহলে কোন ঝুটঝামেলা হয় নি?'

'না।' বলে কিছুক্ষণ থামলাম। মনে পড়ল মোনালিসার কথা। অতএব যোগ করলাম, 'তেমন কিছু নয়।'

তারপর ফিরে এলাম বাইরের ঘরে। নিজের সীটে। লক্ষ্য করলাম, রামকৃপাল খাতায় মন্তব্য লিখে রাখছে রিভলবারটা সম্পর্কে। নিশ্চয়ই লিখছে, রিটার্নড় আনইউজড। আর্মসের ব্যাপারে সিবির কড়াকড়ি ভীষণ সাংঘাতিক। রোজ রাতে খাতায় সই করে প্রত্যেককে আর্মস ইস্যু করতে হয়। আর রিভলবার ব্যবহার করলে তার জবাবদিহি করতে হয় বিশদ রিপোর্ট খাতায় জুড়ে দিয়ে।

ঘড়িতে এখন সাড়ে দশটা। অর্থাৎ অফিস খোলার পর আধ ঘন্টা কেটে গেছে। কিন্তু এখনও সবাই এসে পৌঁছয় নি। একমাত্র আমার পাশের চেয়ারে ঝিম মেরে বসে আছেন ষাট-পেরোনো যুবক সত্যনাথ চক্রবর্তী। কলকাতা পুলিশ থেকে অবসর নেবার পর এ-বি-সি'তে যোগদান করেছেন। বর্তমানে এ-বি-সি'র ইনভেষ্টিগেশানের লোক। খুন-চুরি-ডাকাতি-রাহাজানির কেস ঘেঁটে ঘেঁটে বিশারদ হয়ে পড়েছেন। মোটা। রঙ কালো কুচকুচে। মাথায় অর্ধেক টাক, বাকি অর্ধেক তেলচিটে চুল। ঠোঁট পানের রসে করমচা। আমাকে দেখে বললেন, 'ভায়া, সকাল সকাল তোমার একটা ফোন এসেছিল।' তারপর চোখ ঠেরে, 'হয়তো জুনি দেবী হতে পারেন—,

অবাক হলাম। কে ফোন করবে আমাকে? জুনির ফোন করার কোন প্রশ্ন ওঠে না। আর জুনির সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ির ব্যাপারটা অফিসে কেউ জানে না। কাউকে বলি না। বলতে ভীষণ কষ্ট হয়। তবে কি...... তবে কি মোনালিসা চৌধুরী? ও এই ফোন নম্বর জানবে কোত্থেকে? ও জানে, আমি পার্ক স্ট্রীট থানার এস-আই। কিন্তু....

সামনে এসে দাঁড়াল নমিতা বাসু। সিবির ডিক্টেসান শেষ হয়েছে। উনি আবার নিজের ঘরে ফিরে গেছেন। সিবি সাধারণত ষ্টেনোদের নিজের ঘরেই ডেকে পাঠান,

তবে নমিতার কথা আলাদা। সিবি কখনও রিসেপশনিষ্টদের আসন ছাড়ার পক্ষপাতী নন। তাই নিজেই উঠে আসেন।

আবহাওয়া যে সুরভিত তার প্রমাণ নাসারন্ধ্র পেয়েছে এবং নীরব অভিনন্দন জানিয়েছে নমিতাকে। ওর ঘন নীল শাড়ি চকচক করছে বাইরের –প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম ঘরের আলোয়। চোখ ছোট কিন্তু গভীর। অনেক বড় সাঁতারু অনায়াসে মগ্ন হতে পারে। হতে পারে শ্বাসরুদ্ধ নিরুপায়। ভুরুর ওপর কাটা দাগ হয়তো কামদেবের তীরের আঘাতে জন্ম নেওয়া অভিজ্ঞান। নমিতাকে দেখলে আমি ইন্দ্রিয়াধীন হয়ে পড়ি। ও নিজেও সেটা জানে। বলে, 'আপনার নজর দেখে মনে হচ্ছে, আমাকে নিয়ে ইলোপ করবেন।'

আমি ততক্ষণে শুধু ইলোপ নয়, অনেক কিছুর বিলোপ পর্যন্ত ভেবে ফেলেছি। ওকে দেখলে দ্রুত ও উদ্দাম জীবন বড় বেশি স্বাভাবিক মনে হয়। আর ভীষণভাবে মনে পরে যায় জুনির কথা।

'মিষ্টার সেন, সকালে আপনার একটা ফোন এসেছিল।' নমিতা বলল।

'আগেই বলেছি, মা।' সত্যনাথ হাই তুলে বললেন। ওঁর আলজিভ আছে প্রমাণ পেলাম।

'না, মিসেস সেন নন। ওঁর গলা আমি চিনি।' সত্যদা চমকে উঠলেন। চোখ যথাসম্ভব বড় করলেন।

আমি সজাগ হলাম।

নমিতা আরও যোগ করল, 'ভদ্রমহিলা কিন্তু নাম বলেন নি। বলেছেন, পরে ফোন করবেন।' নমিতা বিদায় নিল। এগিয়ে গেল নিজের আসনের দিকে। ঘড়িতে প্রায় এগারোটা। এ-বি-সি'র নতুন এক কর্মব্যস্ত দিন শুরু হয়ে গেল। কারণ একে একে বাকিরা অফিসে এসে ঢুকেছে। অবিনাস দত্ত, বিলাস পাকড়াশি, মনমোহন বোস, অমিত দত্ত এবং নৃপতি বোস। টাইপিষ্ট দুজন দক্ষিণ ভারতীয়। ফলে প্রকৃত কর্মযোগী।

বেশ চিন্তিতভাবে মাথা ঝুঁকিয়ে বসে রইলাম। ভাবতে লাগলাম স্বপ্নে দেখা মেয়েটির কথা..... ওর চোখ নাক ঠোঁট..... সত্যিকারের শিল্পীরা এর কদর বুঝবে: দা ভিন্সি বুঝেছিলেন। মোনালিসার প্রতিটি দুঃখ, প্রতিটি কষ্ট, আমি কল্পনা করতে শুরু করলাম। ভাবতে চাইলাম, আমার যন্ত্রণাগুলো ওর পরিপূরক হবে। ও আমার কল্প-মানসী। এমন সময় হরিচরণ-অফিসের বেয়ারা-এসে আমাকে পৃথিবীতে নামালো। ফ্যাসফেঁসে গলায় বলল, 'সিবি সাহেব ডাকছেন।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লাম। রাতে কিছু ঘটুক আর নাই ঘটুক, একটা রিপোর্ট দাখিল করাটা অফিসের নিয়ম। সেটা নিয়ে সিবির সঙ্গে কথা বলাটাও নিয়মের

মধ্যেই পড়ে। এখনও দুটোর কোনটাই সারা হয় নি। তাই সিবির তলব।

ঘরে ঢুকতেই সিবি বসতে বললেন মুখোমুখি চেয়ারে। তারপর একটা চুরুট ধরালেন দুবারের চেষ্টায়। ধোঁয়া ছেড়ে গতানুগতিক মেজাজী স্বরে বললেন, 'টেল মি অ্যাবাউট ইওর মিশন।'

হয়তো এই কারণেই মিশন রো'তে আমাদের অফিস ভাড়া নিয়ে ছিলেন সিবি। যাতে সব সময় একটা সাবধানবাণী আপ্তবাক্যের মতো মনের ভেতর ক্রমাগত বেজে চলে, 'মিশন ফার্স্ট, মিশন লাস্ট'। আমি সেই বাজনা শুনে শুনে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। সুতরাং সিবির মোটা ভুরুর নিচে সরাসরি তাকিয়ে বললাম, 'সব কিছু ওঁ শান্তি।' হাসলাম।

'তোমার এলাকায় তাই থাকা উচিত। কারণ ওখানকার দাগীরা এস-আই সেনকে এত শীগগির ভুলতে পারে না।' সিবি চুরুটের আমেজ উপভোগ করে হাসলেন। বললেন, 'সেন, তুমি কিন্তু নিজেকে ঠিক মতো লুকোতে পারছ না। চিন্তিত দেখাচ্ছে। আর, একদম মানাচ্ছে না।'

আমি অপ্রতিভভাবে হাসলাম, 'তেমন কিছু নয়। ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

'সরি। ক্ষমা করো।' কপট ক্ষমা চাওয়ার সুরে সিবি বললেন, 'যাও, কাজে বোসো। হাসিখুশি থাকো। তোমাকে মনমরা দেখলে আমার ভাল লাগে না। তুমি এ অফিসে সবার ছোট– আমার ছেলের মতো।' এক অজানা ব্যথায় সিবির চোখ চকচক করে উঠল।

আমি বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলাম ঘর ছেড়ে। আর সঙ্গে সঙ্গেই নমিতা ইশারায় ডাকল আমাকে। টেলিফোন! দুরু দুরু বুকে এগিয়ে গেলাম।

নমিতা চারিত্রিক হাসি হেসে রিসিভার তুলে দিল আমার হাতে। চাপা স্বরে বলল, 'বেষ্ট অফ লাক!' তারপর সরে গেল।

'হ্যালো–'

'সম্রাট সেন আছেন?' মোনালিসা। মোনালিসা। মোনালিসা।

'বলছি।'

'ইন্সপেক্টর বলার প্রয়োজন আছে?' সুরেলা হলেও কণ্ঠস্বরে ব্যঙ্গের খোঁচাটুকু প্রচ্ছন্ন থাকে নি।

'সুযোগ দিলে অধম সবকিছু বুঝিয়ে বলতে পারে।' অনুনয়ের সুরে বলে উঠলাম, 'তাছাড়া অন্যায়ের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী আমি। যদি..... '

'তার আর দরকার নেই। ভীষণ বিপদে পড়ে আপনাকে ফোন করেছিলাম পার্ক স্ট্রীট থানায়। ওঁরাই বললেন, আপনি পুলিশের চাকরি ছেড়ে এ-বি-সি প্রোটেকশনে জয়েন করেছেন। সেটা সত্যি কিনা যাচাই করতেই ফোন করেছিলাম।

আচ্ছা, নমস্কার।'

'শুনুন–' ব্যস্ত সুরে বলে উঠলাম আমি, 'কি বিপদে পড়ে আমাকে–'

'তার তো আর প্রায়োজন নেই।' নির্লিপ্ত সুরে ও বলল, 'আপনি পুলিশের লোক হলে হয়তো কিছু একটা করতে পারতেন–' ক-র-র-র..... ও টেলিফোন রেখে দিয়েছে।

কথা বলতে বলতে আমি হয়তো সমান্য উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। কারণ শ্লথ ভঙ্গিতে রিসিভার নামিয়ে রাখার সময় লক্ষ্য করলাম, অবিনাশ দত্ত, সত্যদা, বিলাস পাকড়াশি, মনমোহন বোস, প্রত্যেকেই আমাকে অবাক চোখে দেখছে। বাকিরা দেখছে না, কারণ তারা ক্লায়েন্টদের সঙ্গে ব্যবসায়িক ও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত আলোচনায় ব্যস্ত। অবিনাশ দত্ত ও বিলাস পাকড়াশি অপারেশানের লোক। মধ্য কলকাতা ও উত্তর কলকাতায় সাধারণত কাজ করে থাকে। আর মনমোহন বোস আমাদের 'ম্যানেজার –অপারেশান্‌স্‌।'

আমার কান লাল হয়ে উঠল। একই সঙ্গে লু বইছে সাহারার। কারণ লজ্জা ও অপমান যুগপৎ ক্রিয়াশীল হয়েছে। সহকর্মীদের চোখ চকচক করছে কৌতূহলে। কিন্তু সত্যদাকে সামান্য বিব্রত মনে হল। উনি অস্বস্তির চোখে আমার দিকে তাকিয়ে। নমিতা বাসু অন্যসময় হলে হয়তো কোন ইয়ার্কি করত, আমার মুখের অবস্থা দেখেই সম্ভবত চুপ করে গেল। আমি নিজের জায়গায় ফিরে এসে বসলাম।

ভীষণ বিপদে পড়েছে মোনালিসা। কি বিপদ? গতকাল সদর স্ট্রীটের নিত্যনৈমিত্তিক বিপদ থেকে ঘটনাচক্রে আমি ওকে বাঁচাতে পেরেছি। তারপর ঘরের সেই রহস্যময় লোকটির সঙ্গে মোনালিসার সাক্ষাৎ। বাবি। বাবি কি হাজির ছিল সদর স্ট্রীটে? ওর কথা শুনে এটা মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কেন হাজির ছিল ও? ও কি জানত, মোনালিসা আক্রান্ত হবে?

'ভায়া, কি ব্যাপার?' নিচু অপরাধী গলায় সত্যনাথ জানতে চাইলেন।

অফিসে অন্যান্যরা আড়ালে তাঁকে সত্যনাশ চক্রবর্তী বলে রসিকতা করলেও, ভদ্রলোক পরিস্থিতিগত প্রয়োজনে সহানুভূতিশীল ও বুদ্ধিমান। সুতরাং সত্যদাকে বললাম, 'একটা অদ্ভুত ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছি। পরে আপনাকে সব বলব।'

অনেক চেষ্টা করে রিপোর্ট লেখায় মন দিলাম। স্বভাবের দোষে আমি হয়তো পরহিতকর কাজে মন-প্রাণ-সঁপে দেওয়ার সংক্রোমক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছি। ঠিক করলাম, আজ রাতে ডিউটির সময় একবার যাব মোনালিসার ফ্ল্যাটে। শুধু দূর থেকে ওকে একবার দেখব। দেখব ও নিখাদ-নিটোল আছে। কোন চিত্রচোর মোনালিসার দুর্লভ ছবিতে কোন আঁচড় কাটে নি। যদি কাটে, আমি তাকে কেটে ফেলব। আঁশ-বটি দিয়ে।

তিন □ মিডলটন রো

অপরের কান্না শুনতে আমি অভ্যস্ত নই। জমাট অশ্রু যার জীবনের ভিত সে নিজের কান্না শুনে শুনেই অভ্যস্ত হয়, বড় হয়। আত্মীয় পরিজনের কাছ থেকে সরে এসেছি বহুদিন। তারপর আমাকে অতি যত্নে বৃন্তচ্যুত করে আলতো দুই করতলে স্থান দিয়েছিল জুনি মিশ্র। পরিচয় ঘন হওয়ার পর একদিন ও বলেছিল, 'আপনি পুলিশে চাকরি করেন কি করে? এরকম দিশেহারা মন নিয়ে?'

উত্তরে বলেছি, 'জানো, সবাই আমাকে যমের মতো ভয় পায়। কারণ ভালমন্দ বিচার করে হিসেব নিকেশ করে কখনও কোন কাজ আমি করি নি। আজও করি না। তাই চোর-ডাকাত বদমাসরা আমাকে বুঝতে পারে না। মেয়েরাও না·····

'সত্যি?' জুনি হাসলে ওকে দারুণ লাগে।

'হ্যাঁ। যখন আমার গুলি চালাবার কথা, তখন আমি হাত গুটিয়ে বসে থাকি। যখন শান্ত হয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার কথা, তখন রিভলবার নিয়ে যা-নয় তাই করে বসি। অসময়ে হাসি। আমার কান্নাও অসময়ের। হয়তো ভালবাসাও তাই।'

জুনি পরে বলেছিল, সেই মুহূর্তেই নাকি ও প্রথম আমাকে ভালবাসতে শুরু করে। আমার বেহিসেবী চরিত্র ওর জীবনের সমস্ত হিসেব গরমিল করে দিয়েছিল তখন থেকেই। আর আমি এক দিশেহারা ক্লান্ত সিন্ধুসারস, আশ্রয় নিয়েছিলাম থৈ থৈ সমুদ্রের এক তন্বী জাহাজের বুকে, জুনির উষ্ণ বুকে।

এত কথা মনে পরার কারণ হয়তো দরজার ওপিঠ থেকে ভেসে আসা মোনালিসা চৌধুরীর কান্না। যা আমি এই মুহূর্তে, এখানে দাঁড়িয়ে, শুনতে পাচ্ছি।

রাত এখন সাড়ে ন'টা। আজ একটু আগেই বেরিয়েছি। অস্থির মনকে সংযত করে রেখেছি আপ্রাণ চেষ্টায়। সকালে সব কথা শুনে সত্যনাথ বলেছেন, 'অত ভাবনার কি আছে? সরাসরি গিয়ে জেনেই নাও না বিপদটা কিসের! তবে উটকো ঝামেলায় নাক গলানো....' সুতরাং আমি সরাসরি পথই বেছে নিয়েছি। সিবি জানতে পারলে ব্যাপারটা কিভাবে নেবেন জানি না।

আমাকে না জানান দিয়েই আমার হাত দরজায় ধাক্কা দিয়েছে। কান্না রুদ্ধ হয়েছে তৎক্ষণাৎ। আবার টোকা দিয়েছি দরজায়। ভাবতে অবাক লাগছে, প্রায় অচেনা একটি যুবতীর ফ্ল্যাটের দরজায় এই রাতে আমি লজ্জাহীনভাবে দাঁড়িয়ে

রয়েছি। কর্কশ আলো আমাকে ভাঁজ খোলা নতুন শাড়ির মতো উন্মোচিত করে দিয়েছে।

দরজা খুলল মোনালিসা নিজেই। কারণ জনহীন ফ্ল্যাটে ও একা। পরনের কচি কলাপাতা শাড়িটা পরম যত্নে ও আদরে জড়িয়ে রয়েছে ওর অলৌকিক শরীরটা। ফর্সা মুখ এখন থমথমে। চোখ সামান্য রক্তাভ। সব মিলিয়ে এক অস্বস্তিকর মুহূর্ত। আমার মনে প্রশ্নের বাণ ফুঁসে উঠছে ক্রুদ্ধ অজগরের মতো। আমার প্রিয়তমা ছবির চোখে কে যেন এঁকে দিয়েছে অশ্রুর রেখা।

'আপনি?' কান্না-ভেজা চোখে বিস্ময় ফুটিয়ে তুলতে চাইল ও। তারপর সামান্য নির্লিপ্ত সুরে, 'কি চাই?'

ওকে অবাক করে দিয়ে আমি দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লাম ঘরের ভেতরে। ও সন্ত্রস্ত হয়ে দু-পা পিছিয়ে দাঁড়াল। দরজা বন্ধ করে তাতে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালাম। ওর চোখে অনিমেষ দৃষ্টি রেখে বললাম, 'কিসের বিপদ? কে তোমাকে বিপদে ফেলেছে?'

ও হঠাৎই অস্বস্তি পেল। চোখ নামাল। যেন সত্যের পুনরাবৃত্তি করছে এই রকম সুরে বলল, 'আপনাকে ফোন করে ভুল করেছিলাম।'

আমি ওর ভুল ভাঙাতে খুলে বললাম, কেন মিথ্যে পরিচয় দিয়েছিলাম গতকাল। কেন আমি পুলিশের চাকরি ছেড়েছি। সব। আমার অপরাধবোধের একান্ত সুর হয়তো ওর মনে দাগ কাটল। নিরুত্তাপ গলায় বসতে বলল আমাকে। ঘরের নরম সোফায় বসলাম। চোখ এখনও প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে আছে দাঁড়িয়ে থাকা মোনালিসার দিকে। ঘরের সঙ্গে ওকে ভীষণ মানিয়ে গেছে।

ঘরের মেঝেতে নতুন কার্পেট ; টেবিল, সোফা, টিভি, ফুলদানি– সবই রুচিশীল ভাবে স্ব স্ব স্থানে দৃশ্যমান। হালকা সবুজ দেওয়ালে তিনটে ছবি টাঙানো রয়েছে। তার মধ্যে একটা মোনালিসার মুখের ক্লোজ-আপ। উদাসীন চুলের গুচ্ছ ওর চোখের পাতায় ছায়া ফেলেছে।

দরজা-জানালার ঘন নীল ও সাদা ফুলকাটা পর্দার দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হলাম। ও তখনও চুপচাপ দাঁড়িয়ে। যেন মনে মনে আমাকে আঁচ করতে চাইছে। আমরা দুজনেই কোন নির্বাক চলচ্চিত্রের কুশীলব।

হঠাৎই ও বলে উঠল, 'মিষ্টার সেন, শুধু শুধু আমার জীবনে জড়িয়ে পড়তে চাইছেন। আমার মনে কোন আশা নেই, আকাঙ্খা নেই। তবে কাল রাতে আমাকে যে বিপদ থেকে আপনি বাঁচালেন, তাতে মনে নতুন করে আশা জেগে উঠেছিল। ভেবেছিলাম, যে সাপের কুণ্ডলী পাকানো শরীরের চাপে আমার দম আটকে আসছে, আপনি হয়তো–' দরজায় নক করার শব্দ হল।

আমি চকিতে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। মোনালিসার দু'চোখে আতঙ্ক ঝাঁপিয়ে পড়ল ডানা মেলে। ও ঠোঁটে আঙুল তুলে চুপ করে থাকার ইঙ্গিত দিল আমাকে। কে এসেছে? বাবি? সে কি ওর স্বামী?

'মুন্নি! মুন্নি!' দরজার ওপার থেকে জড়ানো স্বর শোনা গেল। কেউ অধৈর্য হয়ে ডাকছে। নামটা কি মোনালিসারই আদরের ডাক নাম?

তাড়াতাড়ি সাড়া দিল মোনালিসা, 'খুলছি। এক মিনিট।'

বুঝলাম, সাড়া না দিলে বিপদ হত। আগন্তুক ভাবত, মোনালিসা ফ্ল্যাটে নেই এবং তখন হয়তো সে নিজের চাবিটা ব্যবহার করত দরজা খুলতে। গতকাল বাবি যেমন করেছিল।

পলকে আমার কাছে এসে গেল ও। আমার হাত চেপে ধরল। এবার আমি জাহান্নামে যেতেও রাজি। চাপা ফিসফিসে স্বরে বলল, 'আসুন, শীগগির আসুন আমার সঙ্গে–'

প্রতিবাদহীন ভাবে অনুসরণ করলাম ওকে। বসবার ঘর পেরিয়ে শোবার ঘর। ঘরটা অন্ধকার। তবে বহু-পরিচয়ের নিশ্চিত পদক্ষেপে আমাকে নিয়ে চলল মোনালিসা। ইতিমধ্যে দরজার টোকা পরিণত হয়েছে ধাক্কায়। জড়ানো স্বরের চিৎকারও শোনা গেছে বার দুয়েক। শোবার ঘর থেকেই 'যাচ্ছি–' বলে উত্তর ছুঁড়ে দিয়েছে মোনালিসা, তারপর আমরা ঢুকে পড়েছি বিশাল এক বাথরুমের মধ্যে। একটা দরজা খুলে গেল। চাঁদের আলো এসে পড়ল তৎক্ষণাৎ এবং দেখতে পেলাম ঘোরানো লোহার সিঁড়ি। কুণ্ডলী পাকিয়ে নিচে নেমে গেছে।

'শীগগির চলে যান, এক্ষুণি!' ও চাপা উৎকণ্ঠায় বলে উঠল।

আমি অনড় দাঁড়িয়ে রইলাম। বললাম,'তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। প্লীজ।'

ও তাকাল আমার চোখে। এক মুহূর্ত কি যেন ভাবল। চাঁদের আলোয় ওকে দেখলাম। ওর হাত এখনও ধরে আছে আমার হাত। ও বলল, 'কাল এগারোটায় বিড়লা প্ল্যানেটারিয়ামের সামনে দেখা করবেন। সব বলব–'

'আমি তোমাকে বাঁচাতে চাই, মোনালিসা। বিশ্বাস করো।'

এই প্রথম ওর নাম উচ্চারণ করলাম–ওর সামনে দাঁড়িয়ে। মস্তিস্কে অস্থির ভূমিকম্প সক্রিয় হল। অতীত–বর্তমান –ভবিষ্যৎ সব ভুলে গেলাম। আমার দুহাত অবাধ্য হল। নিমেষে কাছে টেনে নিল উপকারিণীকে। আমার ঠোঁট মিশে গেল ওর অস্ফুট শব্দ সৃষ্টিকারী ঠোঁটে। ছায়া ছায়া আঁধারে আমরা কোন এক অজ্ঞাত সূত্রে বাঁধা পড়লাম। সেই মুহূর্তেই কানে এল চাবি ঘুরিয়ে ফ্ল্যাটের দরজা খোলার শব্দ।

ও ছিটকে গেল আমার বাঁধন থেকে। আমাকে আলতো করে ঠেলে দিল সিঁড়ির

দিকে। তারপর খিড়কি দরজাটা বন্ধ করে দিল। আমি তারই মধ্যে ওকে কথা দিলাম, এগারোটায় আসব। তারপর ঘোরানো লোহার সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করলাম। ভূমিকম্পে ছত্রখান আমার মস্তিস্ক আবার ধীরে ধীরে ফিরে আসছে চেতনার জগতে।

নিজের ঠোঁটে বার তিনেক আঙুল বুলিয়ে নিলাম। আমার এই মুহূর্তের অস্তিত্ব বাস্তব কিনা যাচাই করতে স্পর্শ করলাম নিজের নাক-মুখ-চোখ। মোনালিসা, তুমি আমায় গুণ করলে? আমি যে সুখ পেতে অভ্যস্ত নই। জুনি একদিন খুব কঠিন গলায় কান্না চেপে আমাকে বলেছিল, 'তুমি কোনদিন সুখী হতে পারবে না, সম্রাট। কারণ তোমার শিরায় শিরায় অ-সুখ। তোমার ভালবাসা অবাস্তব। সে মাটিতে পা ফেলে না, তাই তার প্রতিদান দেওয়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়– শত চেষ্টা করলেও।' মোনালিসা, যদি কখনও ও আমাকে ভালবাসে, কি একই কথা বলবে?

ঘোরানো সিঁড়ি একসময় শেষ হল। আধো-আঁধারি ছোট্ট কাঁচা গলি। দু'পাশের দেওয়ালে শুধু লোহার পাইপ। আর ইতস্তত কিছু আবর্জনা। সাবধানে পা ফেলে ফুটপাথে বেরিয়ে এলাম। জানি না, মোনালিসার ঘরে এখন কি নাটক শুরু হয়েছে। ও কি ধরা পড়ে গেছে সেই আগন্তুকের কাছে? মুখ তুলে চেষ্টা করলাম ওর ফ্ল্যাটের দিকে দেখতে। হ্যাঁ, আলো জ্বলছে। শোবার ঘরেও। মনের মধ্যে একটা কাঁটা কোন এক অজানা কারণে খচ করে উঠল। কিন্তু প্রচণ্ড ব্যথাটা অনুভব করলাম তলপেটে। কারণ ভারী বুটের একটা লাথি সেখানে এসে আছড়ে পড়েছে। আমি ওপর দিক থেকে চোখ পুরোপুরি নামানোর আগেই দ্বিতীয় লাথিটা বুকে এসে পড়ল খুব সহজে। কারণ প্রথম আঘাতের পর আমি ঝুঁকে পড়েছিলাম সামনের দিকে।

'বাবি, তুমি?' মোনালিসা বলে উঠল।

শোবার ঘর পেরিয়ে বসবার ঘরে এসে পৌঁছতেই আগন্তুকের মুখোমুখি হয়েছে ও।

'হ্যাঁ, আমি।' বাবি। দুটো সরল চোখ মেলে ধরে আছে মোনালিসার শরীরের ওপর। ধীরে ধীরে সেই দৃষ্টি সন্দেহকুটিল হল। লাল-কালো চেক-কাটা টেরিকটনের কোট খুলে রাখল সোফার ওপর। স্খলিত পায়ে কয়েক ধাপ এগিয়ে এসে জড়ানো গলায় বলল, 'দরজা খুলতে দেরি হল কেন?'

উদ্ধত ছত্রপতির সুর বাবির গলায়। ঘরের প্রতিটি জিনিস সে দেখতে লাগল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। যেন আন্দাজ করতে চাইছে, ঘরে কেউ এসেছিল কি না। আর এসে থাকলে সে কে। তার ভুরুর ভাঁজ ঘন হল।

পায়ে পায়ে মোনালিসার পাশ কাটিয়ে শোবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল সে।

ঘরের আলো জ্বেলে দিল। তারপর বসল নরম বিছানায়। পোশাক খুলতে শুরু করল বিনা ভূমিকায়। যেন এসব অত্যন্ত স্বাভাবিক। প্রাত্যহিক কর্মসূচীর মধ্যেই পড়ে। একে একে জুতো, প্যান্ট, গেঞ্জি সবই আশ্রয় পেলো কার্পেটের ওপর।

মোনালিসা ফিরে তাকিয়ে বাবিকে দেখছে। ভারী গলায় বাবি জিজ্ঞেস করল, 'কে এসেছিল?'

'কেউ না।'

বিশ্রীভাবে হাসল বাবি। বলল, 'যেই আসুক, আমার আসা-যাওয়া তাতে আটকাবে না।' একটু থেমে প্রেমজর্জর গলায় যোগ করল, 'আমি তোমাকে দারুণ ভালবাসি, মুন্নি।'

'থুঃ থুঃ!' শব্দ করে মেঝেতে থুথু ছিটিয়ে দিল মোনালিসা।

আহত কোণঠাসা বাঘিনীর অভিব্যক্তিতে ঘৃণার সূক্ষ্ম রেখা জন্ম নিল পলকে। বাবি বিচিত্র নিরাবরণ বেশে নেমে এল বিছানা থেকে। মোনালিসা নিথর, নিস্পন্দ। এগিয়ে এসে ওর হাত ধরল বাবি। মুখে মদের জমাট গন্ধ। বলল, 'চলো ডার্লিং।' তারপরই সর্বশক্তিতে জাপটে ধরল যুবতীকে। অবাধ্য হাত ও ঠোঁট ওর শরীরের যত্রতত্র চলাফেরা করতে লাগল, 'মুন্নি, সোনামণি আমার ...উম্ ম্'........'

মোনালিসার গায়ে যেন হাজার শুঁয়োপোকা চলে বেড়াচ্ছে। ওর গায়ে কাঁটা দিল। বিবশ হয়ে ও নিজেকে ঢেলে দিল বাবির ওপর। কচি কলাপাতা শাড়ি ও তার প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ অদৃশ্য হল মোনালিসার শরীর থেকে। বাবি তখন দিশেহারা। কোথা থেকে শুরু করবে বুঝে উঠতে পারছে না। গলার স্বর আরও ভারী আরও অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। মোনালিসাকে টানতে টানতে ও নিয়ে গেল বিছানার দিকে। আছড়ে পড়ল নরম গদীতে। হঠাৎই কি মনে পড়ায় বিছানা ছেড়ে নেমে এল বাবি। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল বসবার ঘরে। রেখে যাওয়া কোটের পকেট হাতড়ে বের করল একটা ঝলমলে পাথর বসানো জড়োয়া নেকলেস। তারপর হাত বাড়িয়ে নিভিয়ে দিল বসবার ঘরের আলো এবং রওনা হল বিছানায় ফেলে আসা অব্যবহৃত স্থাপত্য শিল্পের দিকে।

কিন্তু মোনালিসা ভাবতে চেষ্টা করছিল সম্রাট সেনের কথা। গত রাতের কথা। আজ রাতের কথা।

নিজের অতীত সম্পর্কে খুব দুঃখী নয় ও। কারণ সেই বিষণ্ণ অতীত ও ভয়ঙ্কর বর্তমানের জন্যে ও নিজে দায়ী নয়। হঠাৎই ওর চিন্তায় বাধা পড়ল। কারণ একটা ঝলমলে নেকলেস ছিটকে এসে পড়েছে ওর বুকের ওপর। শীতল ধাতব স্পর্শে মোনালিসা কুঁকড়ে গেল। পরক্ষণেই নেকলেসকে অনুসরণ করে একই ভাবে ওর শরীরে স্থাপিত হল বাবি।

মোনালিসার বুক ও নেকলেস একই সঙ্গে স্পর্শে অনুভব করে বলল, 'তোমার জন্যে, মুন্নি। বিশ হাজার।'

মোনালিসা চুপ করে রইল। শুধু নেকলেস কেন, ওর এই আধুনিক আবাসের প্রতিটি বিত্ত, প্রতিটি বৈভবের জন্যে ও বাবির কাছে ঋণী। সেই ঋণের শোধ বাবি চায় এইভাবে। প্রতি রাতে।

'গতকালের দেবদূতের কি খবর, বলো?' মজার সুরে বলল বাবি। নেকলেসটা তার নড়াচড়ায় পড়ে গেল মোনালিসার শরীর বেয়ে বিছানায়। বাবি নিজের শরীর প্রয়োজন মতো গুছিয়ে নিল। একসময় সন্তুষ্ট হল। মোনালিসাকে আপ্রাণে আঁকড়ে ধরে বলল, 'আমি দেবদূত নই মুন্নি, শুধুই মানুষ। তবে শক্তিতে হাজার দেবদূতের চেয়ে কম নই। দ্যাখো, আই অ্যাম গোয়িং টু প্রুভ ইট। রাইট? ফিল ইট?'

মোনালিসার শরীর অনুনাদী হল বাবির ছন্দে। সেই অপ্রীতিকর ঘটনাটা ঘটছে এখন। মনকে নির্বিকার রাখতে পারলেও শরীর নির্বিকার থাকছে না। বরং প্রচণ্ড বিকারগ্রস্ত হয়ে উঠতে চাইছে এই বিশেষ মুহূর্তে। মোনালিসার মনের শাসনের অবাধ্য হল ওর শরীর। সেই অবাধ্যতা অনুভব করে আরও উদ্দাম, আরও বেসামাল, আরও খুশি হয়ে উঠল বাবি। অস্ফুটে পাগলের মতো বলতে লাগল, 'মুন্নি! মুন্নি! আই মেড ইট! আই মেড ইট হ্যাপেন!'

অবশেষে বাবি ও মোনালিসা শান্ত হল।

মোনালিসার চোখ দিয়ে তখন জল গড়িয়ে পড়ছে অঝোরে। সম্রাট সেনের দুর্লভ ছবি কাঁদছে। কেউ তাতে আঁচড় কেটেছে নিষ্ঠুরভাবে। এসো, দেখে যাও তোমরা।

কে এই নিষ্ঠুর আঘাতকারী, আমি জানি না। তার উদ্দেশ্যও আমার কাছে অস্পষ্ট। ভাল করে কিছু ঠাহর করার আগেই আমি ছিটকে পড়েছি ফুটপাথে। আক্রমণকারীর ধারণা হওয়াটাই স্বাভাবিক যে শারীরিক দিক থেকে আমি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। তাই সে কয়েক পলক সময় দিল আমাকে। ততক্ষণে আমার হাত খুঁজে পেয়েছে শোল্ডার আর্মি হোলস্টারের ০·৩৮ স্পেশালটা এবং সরাসরি গুলি করেছি দু-পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে থাকা ছায়াটাকে লক্ষ্য করে। পর পর তিন বার। প্রতিপক্ষকে চমকে দিয়ে।

লক্ষ্যভেদ হল কি না জানি না, তবে ভীষণ অবাক হয়েছে সে। ঘুরে দাঁড়িয়ে পলায়নপর হতেই নজরে পড়ল তার চলায় কোথায় যেন তাল কেটে গেছে। আমার মাথার ভেতর রক্তের ঢেউ বল্গাহীন ছুটোছুটি শুরু করে দিয়েছে। তলপেটে ও বুকে অসহ্য যন্ত্রণা। অনুভব করলাম গুলির নিনাদী শব্দে কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা ছুটে আসছে এদিকেই। আর চিৎ হয়ে শোয়া অবস্থায় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি মোনালিসার

ফ্ল্যাট। শুধু শোবার ঘরে আলো জ্বলছে। আমি হাঁ করে শ্বাস নিতে লাগলাম। রিভলবার ডান হাতের মুঠোয় শিথিল। আকাশে ম্লান চাঁদের আলো যেন সমবেদনা জানাচ্ছে আমাকে। পায়ের শব্দগুলো আরও কাছে এগিয়ে এসেছে। একসময় মোনালিসার ঘরের আলো নিভে গেল। চাঁদও ঢেকে গেল মেঘের পর্দার আড়ালে।

চার □ ক্যাথিড্রাল রোড

ঘড়িতে এগারোটা এখনও বাজে নি। এবং আমি অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। কোন প্রেমিকের জীবনে এই অপেক্ষায় সময়টুকুর মহার্ঘতা এক কথায় ঐশ্বরিক। অন্তত আমার কাছে। এই অপেক্ষার সময় যদি না ফুরোয় তাহলে কেমন হয়? মোনালিসার মনে আছে তো আমার কথা? ও আসবে, এই প্রত্যাশাটুকু আমার শরীরের সমস্ত যন্ত্রণা ভুলিয়ে দিয়েছে। ভুলে গেছি কালচে নীল রঙের দুটো বীভৎস কালসিটের কথা।

আজ সকালে যখন আর্মস সেকশানে রিভলবারটা রামকৃপালকে ফেরত দিই, তখন সে অবাক হয়েছিল। কারণ চেম্বার খুলে ও গন্ধ শুঁকে গতরাতের গুলিবৃষ্টির প্রমাণ সে পেয়েছে। আমি সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট লিখে সই করে দিয়েছি ওর রেকর্ডের খাতায়। তারপর বিস্তারিত বিবৃতি লিখে দেখা করেছি সিবির সঙ্গে।

আমি যে সামান্য খুঁড়িয়ে হাটছি, সেটা সিবির নজর এরায় নি। তাঁর সহাস্য মুখে চিন্তার ভ্রূকুটি ফুটে উঠল। বললেন, 'সেন, কি ব্যাপার?'

আমি নির্বাক থেকে টাইপ করা রিপোর্টটা তাঁর হাতে তুলে দিলাম। বললাম, 'গতকাল তিন রাউণ্ড গুলি আমাকে ছুড়তে হয়েছে আত্মরক্ষার জন্য।'

'তিন-রাউণ্ড!' সিবি চোখ কপালে তুললেন, 'তাহলে বলো তোমাকে এক রেজিমেন্ট আর্মি অ্যাটাক করেছিল!'

'না, মাত্র একজনই।' বিব্রতভাবে বললাম, 'আসলে আমার তখন মাথা ঠিক ছিল না। লোকটাকে আমি খুন করে ফেলতে চেয়েছিলাম।'

সিবি চিন্তিত হলেন। ভুরুজোড়ার মধ্যবর্তী দূরত্ব অনেকটা কমে গেল কপালের কুঞ্চনে। বললেন, 'সেন, এটা বোধহয় একটু বাড়াবাড়িই হয়ে গেছে। তুমি ভাল করেই জানো, পুলিশের চাকরি তোমাকে কেন ছাড়তে হয়েছে। এখন এই ফায়ারিং নিয়ে পুলিশী তদন্ত হবে। আমাকেই তার জবাবদিহি করতে হবে।' গলার সুর পালটে এবার স্থান পেল স্নেহের ছোঁয়া, 'আসলে কি জানো, এ ধরনের প্রোটেকশন কোম্পানির বিপদ অনেক। পুলিশ এদের ভাল চোখে দেখে না। অনেক দিক বাঁচিয়ে আমাদের চলতে হয়।'

আমি নিশ্চুপ রইলাম।

অবশেষে আমি বিদায় নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই উনি বললেন, 'তোমার রিপোর্টে আমি আক্রমণকারীর সংখ্যা চার-পাঁচজন করে দিচ্ছি। আর বলে দিচ্ছি, তারা প্রত্যেকেই আর্মড ছিল।'

আমি বেরিয়ে আসছি, সিবি পিছু ডাকলেন, 'সেন-'

থমকে দাঁড়ালাম।

'যদিও তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, তবু বলছি।' সামান্য ইতস্তত ভাব। তারপর হেসে, 'মেয়েদের ঝামেলায় নিজেকে বেশি জড়িও না। একথা বলছে, জ্ঞানবৃদ্ধ কর্নেল বটব্যাল। জীবন যুদ্ধে ও সামরিক যুদ্ধে যার অগাধ অভিজ্ঞতা, বুঝলে?' অবশেষে আন্তরিক হাসি।

বুঝলাম, সত্যনাথ চক্রবর্তী মোনালিসার ব্যাপারে প্রতিশ্রুত গোপনীয়তা রক্ষা করেন নি। সিবির কৃপাদৃষ্টি লাভের আশায় কোম্পানির ডিউটির অমূল্য সময়ের কিছু অংশ যে নারীসংক্রান্ত কাজে আমি ব্যয় করেছি সেটা যথাস্থানে জানাতে একটুও দেরি করেন নি।

নিজের সীটে ফিরে এলাম। আমার থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে কেউ কোন ঠাট্টা-রসিকতা করার সাহস পায় নি। সত্যদা বার দুয়েক চোরা চাউনিতে আমাকে লক্ষ্য করেছেন। আমি কাগজপত্র গুছিয়ে আবার ফিরে গেছি সিবির কাছে। বলেছি, দু-তিন ঘন্টার জন্য আমার ছুটি চাই। ব্যক্তিগত প্রয়োজন। তৎক্ষণাৎ স্মিত হেসে ছুটি মঞ্জুর করেছেন সিবি। আর আমিও বেরিয়ে এসেছি অফিস থেকে। বেরোবার সময় কানে এসেছে নমিতা বাসুর মিহি গলা, 'বেষ্ট অফ লাক!'

লাক যে বেষ্ট না হলেও তার কাছাকাছি, সেটা বুঝলাম দূরে অপ্রস্তুত পায়ে এগিয়ে আসা মোনালিসার দিকে চোখ পড়তেই। কারণ ঘড়ির কাঁটা সবে এগারো পেরিয়ে মাত্র মিনিট পাঁচেক এগিয়েছে, তার মধ্যেই আমার আকাশে সূর্য উঠেছে সোনালী কিরণের মালা গলায় দিয়ে।

ও যেন হাওয়ায় ভেসে এগিয়ে এল আমার কাছে। আমরা মুখোমুখি হলাম। ওর পরনে আমাদের প্রথম আলাপের সাদা রঙের শাড়িটা। সঙ্গে সবুজ ব্লাউজ। কপালে কালো টিপ যথারীতি। হালকা শীতের হাওয়ায় আমার শরীর শিউরে উঠছে থেকে থেকে। উজ্জ্বল দিনের আলোয় অপলকে ওকে দেখতে লাগলাম। ওকে দেখলে দেখা কখনও শেষ হয় না।

পায়ে পায়ে আমরা হাঁটতে শুরু করেছি রাস্তা পেরিয়ে খোলা মাঠের দিকে। সবুজ ঘাস এখন দুষ্প্রাপ্য। এক বিশাল গাছের ছায়ায় তাও পাওয়া গেল অবশেষে। ওকে বললাম, 'বসব?'

ওর নীরব অনুমতি পেলাম। বসলাম দুজনে।

সময় প্রায় দুপুরের শুরু, ফলে এক অদ্ভুত নির্জনতা চারিদিকে। কর্কশ দিনের আলোয় যা বেমানান। মাথার ওপরে গাছের পাতার ঘন ছাউনি। কিন্তু সেই ঘন ছাউনির ফাঁক-ফোকর দিয়ে ঠিকরে আসছে সূর্যকিরণ। জলছবির মতো সোনালী গোলাকার প্রতিবিম্ব সংখ্যাহীন ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে আমাদের শরীরে ও সবুজ ঘাসে। নিরাকার নিস্তব্ধতায় থেকে থেকে বিদ্রোহ তুলছে দূরের রাস্তা দিয়ে ছুটে যাওয়া বাস ও গাড়ির গর্জন। ঠাণ্ডা হাওয়া বখাটে খোকার মতো ওর চুল নিয়ে খেলা করছে। একটা মিষ্টি শব্দ কানে আসতেই প্রমাণ পেলাম আজও এখানে লুকিয়ে পাখি ডাকে। আর আমি ততক্ষণে ফ্রেমে বাঁধানো কোন স্বপ্নের ছবি হয়ে গেছি।

'মোনালিসা ..... এবারে বলো..... সব।' আমি অস্ফুটে বললাম। ও অনেকক্ষণ মাথা নিচু করে রইল। তারপর বলল, 'তোমাকে আমি ভাল করে এখনও চিনি না, কিন্তু বিশ্বাস করো, এতটা নিজের করে কেউ কখনও আমাকে কাছে ডাকে নি। ভেবেছিলাম তোমাকে সব বলব, কিন্তু তাহলে আজকের এই সুন্দর মুহূর্তগুলো নষ্ট হয়ে যাবে।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ও আবার বলল, 'আজ নয়..... অন্যদিন..... কথা দিচ্ছি।'

অনুভব করলাম একটা অজ্ঞাত দ্বন্দ্ব ওকে কুরে কুরে খাচ্ছে। ও মুখ তুলে তাকাল। বলল, 'শুধু এটুকু এখন বলতে পারি, জীবনের ঋণ আমাকে দিনের পর দিন শোধ করতে হচ্ছে...'

'সে ঋণ আমি শোধ করব। কথা দিলাম।' আমার প্রতিজ্ঞার সুরে ও ক্লিষ্ট হাসল শুধু।

এরপর আমরা সময়জ্ঞান হারিয়ে বসে রইলাম দুজনের কাছাকাছি। কখন আকাশে তারারা উঁকি মেরেছে জানি না। শীতের হাওয়ার বর্শা আরও তীক্ষ্ণ হয়েছে আমাদের অজ্ঞাতসারে।

অবশেষে এসেছে বিদায়ের পালা। ওর ঠোঁট ছুঁয়ে আমি সমবেদনা জানিয়েছি। ও তাতে সাড়া দিয়ে ছোট্ট করে বলেছে, 'আমি আর কাউকে ভয় পাই না।' কান্নায় স্বর বুজে এসেছে ওর।

পরদিন সন্ধ্যায় দেখা করব এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়ে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়েছি।

পাঁচ ☐ আকাশ পাতাল রোড

সবুজ অ্যাম্বাসাডার গাড়িটা রাস্তার মাঝ বরাবর ছুটে চলেছে। প্রতিটি বাঁক নিচ্ছে অতি সাবধানে, অভ্যস্ত সহজ ভঙ্গিতে। রাস্তার দু'পাশে আলোর দুর্ভিক্ষ। যে কয়েকটা রশ্মি চোখে পড়ে তা শীর্ণ কঙ্কালসার। গাড়ির পেছনে টেল লাইটের রক্তচক্ষু বিজোড়, সঙ্গীহীন। গাড়ির চালক আলোছায়ায় অস্পষ্ট। তার চোখের শূন্য দৃষ্টি স্পষ্ট বলে দেয় তার মন ভীষণ ব্যস্ত। কারণ সে ভাবছে কয়েক ঘন্টা আগের নৈশদৃশ্যের কথা শত চেষ্টাতেও যেন ভুলতে পারছে না।

মুন্নির সব কিছুর অধিকারে সে অধিকারী। আর তরুণ? রোগা চারচোখো তরুণ চৌধুরী তার মেরুদণ্ডহীন ব্যক্তিতে কি ইস্পাতের মেরুদণ্ড কিনে এনে লাগিয়ে নিয়েছে? নইলে মুন্নি কিসের জোরে এত বিদ্রোহী হয়ে ওঠে?

মুন্নি ও তরুণের কথা ভাবতে ভাবতেই গাড়িটা গন্তব্যে পৌঁছে গেল। বিশাল লোহার গেট পেরোল, সুরকি ঢালা পথ অতিক্রম করল, এসে থামল বন্ধ দরজার সামনে। গাড়ি থেকে নামল বাবি। সিঁড়ি ভেঙে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। চাবি বের করল পকেট থেকে। দরজা খুলল। খুব আস্তে চাপ দিয়ে ঠেলে দিল দরজার পাল্লা। ভেতরে ঢুকল। সব অন্ধকার। স্বাভাবিক। কারণ রাত এখন প্রায় বারোটা।

সুইচ টিপে টিমটিমে আলঙ্কারিক বাতিটা জ্বেলে দিল বাবি । এগিয়ে গেল টেলিফোনের কাছে। রিসিভার তুলে নিয়ে ডায়াল করল। তারপর অপেক্ষা ।

ও-প্রান্তে কেউ ফোন তুলে নিল।

'হ্যালো....'

'তৈরি আছো তো?' বাবি টেনে টেনে প্রশ্ন করল। মদের গন্ধ হলকা ছুঁড়ে দিল নাকে।

ও প্রান্তের কণ্ঠ সচকিত হল বলল তৎক্ষণাৎ, 'হ্যাঁ, আছি।'

'তাহলে বেরিয়ে পড়ো এখুনি। আজ রাতেই শেষ করে দাও। তবে অ্যালার্ট থেকো।'

'ও-কে।'

দুপ্রান্তেই রিসিভার নামিয়ে রাখল। বাবি মাথার চুলে হাত বুলিয়ে নিল। তরুণ চৌধুরীর কিনে আনা শিরদাঁড়া আজ রাতেই ভেঙে দেওয়া হবে। চূর্ণবিচূর্ণ করে। আর

একই সঙ্গে ধ্বংস হবে শরীরী যুবতীর অহঙ্কার।

আলো নিভিয়ে পাশের ঘরে ঢুকল সে। এখানেও অন্ধকার। তবে জানালা খোলা থাকায় চোখে পড়ছে অস্পষ্ট সাদা বিছানা। বিছানায় কেউ যেন শুয়ে আছে। বাবি ঘরের ভেতরে আরো কয়েক পা এগোতেই ঘরের আলো জ্বলে উঠল অকস্মাৎ এবং বাবি নিজের ভুলটা বুঝতে পারল। বিছানা খালি। চকিতে ও ঘুরে তাকাল দ্বিতীয় ব্যক্তির সন্ধানে। তাকে দেখতে পেল।

গাল দুটো অস্বাভাবিক ফোলা। চোখ অনুপাতে অনেক ছোট। মাথায় চুল কাঁধ পর্যন্ত। কোঁকড়ানো। ঠোঁটে গাঢ় রঙের লিপস্টিক। চোখে ম্যাসকারা। সব মিলিয়ে প্রসাধন উগ্রতম। মহিলা বসে আছেন একটি চেয়ারে। একটা বিদেশী কম্বলে কোমর থেকে পা পর্যন্ত পুরোপুরি ঢাকা। ফলে চেয়ারের যে অস্তিত্ব আছে সেটা বোঝা যাচ্ছে একমাত্র তার বসার ভঙ্গি থেকে।

দুজনে চোখে চোখে তাকাল। ঘরের দেওয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজতে শুরু করল অসল সুরেলা ছন্দে।

'এত রাত করে জেগে রয়েছ কেন?' বাবির স্বর এখন একেবারে পাল্টে গেছে। অনেক মমতায় ভরা।

মহিলা অপ্রতিভভাবে হাসল, 'ঘুম যে আসে না, বাবি।' কিছুক্ষণ মাথা ঝুঁকিয়ে কম্বলের প্রান্ত ধরে নাড়াচাড়া করে, 'তুমি না ফেরা পর্যন্ত কখনও ঘুমোতে পারি না আমি।'

বাবি জামা-কাপড় ছাড়তে শুরু করে ক্লান্ত হাতে। মহিলা দেখে। একসময় বলে ওঠে, 'তোমার খাবার ঢাকা আছে রান্নাঘরে।'

বাথরুমের দিকে যেতে যেতে বাবি বলল, 'জানি।'

কানে আসছে জলের ধারা অস্থির ভাবে ছড়িয়ে পড়ার শব্দ। বাবি স্নান করছে। কান পেতে শুনছে মহিলা। তারপর রঙীন নখ-শোভিত ডুমো ডুমো হাতে কম্বলের নিচ থেকে বের করে নিয়ে এল একটা হাত আয়না। ঘাড় বাঁকিয়ে, মুখ তুলে পরীক্ষা করতে লাগল প্রসাধন। গুনগুন করে সুর জাগাল ঠোঁটে। মাঝে মাঝে চুলের গোছা, ভুরু, চোখের পাতা ঠিক করে নিতে লাগল। ঘরের জোরালো ফ্লুরেস্টেড বাতির আলোয় ঝিকমিক করছে কপালের টিপ, নাকের নথ, কানের দুল, ও ঘন নীল সিল্কের শাড়ির সোনালি জরির পাড়। মনে হতে পারে, মহিলা সময় অসময় সম্পর্কে উদাসীন। বাবি ফিরে এল। পরনে ডোরাকাটা স্লিপিং স্যুট। ভিজে চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো। মহিলার মুখের কাছে মুখ এনে ঠোঁট ছোঁয়ালো গালে। বলল, 'এসো, শোবে এসো।'

'হ্যাঁলো-চলো।' শিথিল স্বরে বলল মহিলা। কম্বল খসে পড়ল মেঝেতে।

এবং এই প্রথম ইনভ্যালিড চেয়ারটা দেখা গেল। পায়ের কাছে ঝুঁকে পরে নীল শাড়ির ঝুলন্ত অংশটাকে মুঠোর ধরে মুড়ে নিল বাবি। তুলে দিল মহিলার কোলের ওপর। এখন বোঝা যাচ্ছে, উরুর মাঝামাঝি জায়গা থেকে মহিলার দুটো পা কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে। শাড়িতে মোড়া ভোঁতা দুটো পিণ্ড প্রকট হয়ে জানিয়ে দিচ্ছে, 'এক কালে আমরা দু-দুটো পায়ের মালিক ছিলাম।'

শিশুর মতো মহিলাকে কোলে তুলে নিল বাবি। মহিলা তাকে আঁকড়ে ধরল দুহাতে। পরম স্নেহে ওকে বিছানায় শুইয়ে দিল। চাঁদর টেনে দিল গায়ে। আলো নিভিয়ে নিজেও শুয়ে পড়ল পাশে। খোলা জানালা দিয়ে একফালি জ্যোৎস্নার আলো এসে পড়েছে ওদের শরীরে। কিছুক্ষণ চুপচাপ। শুধু দেওয়াল ঘড়ি টিকটিক ক্লান্তকারী ছন্দে শব্দময়।

'কেমন লাগল আজ?' মহিলার আকস্মিক প্রশ্ন।

চমকে ফিরে তাকাল বাবি। মহিলার ছোট ছোট দুটো চোখ খোলা জানালায় নিবদ্ধ।

নিজেকে সামলে নিয়ে সে জবাব দিল 'ভাল'। সেই সঙ্গে একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাসও বেরিয়ে এল বুক ঠেলে। মনে পড়ল প্রতিবাদমুখর মুন্নির কথা। জিভে তেতো স্বাদ পেল বাবি।

'বাবি, রোজ রাতে এভাবে শুয়ে শুয়ে আমার মনে পড়ে আমাদের আগেকার দিনগুলোর স্মৃতি। আমার অ্যাক্সিডেন্টের আগের দিনগুলোর কথা। সে কতদিন হয়ে গেল বলো তো! তুমি-তুমি এক অবাক করে দেওয়া পুরুষ ছিলে। আমি যন্ত্রণার আনন্দে ভেঙেচুরে কুটি কুটি হয়ে যেতে চাইতাম। মনে হত সেই অদ্ভুত সময়টার বুঝি আর শেষ হবে না। সত্যি, শেষ হতও না।' মহিলা ফিরে তাকাল বাবির দিকে। সরে এল আরও কাছে। ওর উরুর কাটা অংশের উর্বাস্থি বিঁধছে বাবির উরুতে। বলল, 'বাবি, তুমি কি লোহার তৈরি?...... আচ্ছা, আর একবার, একটিবার আমাকে সেই সুখ সেই আনন্দ দিতে পার না তুমি? বলো? '

'ঘুমিয়ে পড়ো, নন্দিতা।' নির্লিপ্ত স্বরে বলল বাবি, 'তুমি তো জানো, ডাক্তারের বারণ আছে। সেই ভয়ঙ্কর অ্যাক্সিডেন্টের পর কখনও ভাবিনি তোমাকে ফিরে পাব, আরও ভয় ছিল পাপুর জন্যে। ওর জন্ম নিতে তখন তো মাত্র মাস তিনেক দেরি ছিল।' আবার দীর্ঘশ্বাস, 'আমি খুব ভাগ্যবান নন্দিতা যে, তোমাদের দুজনকেই ফিরে পেয়েছি। তুমি ...... তুমি বলতে গেলে তোমার পা'দুটোর বিনিময়ে পাপুকে বাঁচিয়েছ।

ওঃ......'

'আমার দুঃখ কি জানো?' বলল নন্দিতা, 'তোমাকে কাছে পেয়েও পাই না।

তোমার শরীরের চাহিদা কতখানি, আমি জানি।' অনমনীয়, দীর্ঘস্থায়ী, ভাবল বাবি, 'যখন সুস্থ সবল ছিলাম, তখন সে চাহিদার প্রতিটি কণা আমি মেটাতে চেষ্টা করেছি প্রাণ দিয়ে। কিন্তু এখন রোজই চিন্তা হয় সে চাহিদা যে মেটাচ্ছে, সে ঠিক মতো পারছে কি না। পারছে?' উদগ্রীব হল নন্দিতা।

'পারছে, তবে তোমার মতো করে নিশ্চয়ই নয়।' হেসে বলল বাবি। মনে পড়ল মুন্নির কথা।

আরও কাছে ঘেঁষে এল নন্দিতা। আদুরে স্বরে বলল, 'আমাকে সব বলো না গো। শুনে দেখি, ও আমার মতো, নাকি আমার চেয়ে ভাল। বলো না, বাবি। সব বলো, একটু একটু করে, প্লীজ!'

বাবি তেতো হাসল। এই মুহূর্তে নন্দিতাকে ভীষণ বুড়ি দেখাচ্ছে। রোজ রাতে ফেরার পর ওকে সব বলতে হয়। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শোনে ও। দোষ ত্রুটি খুঁজে বের করে মোনালিসার। বলে, 'বাবি, আমি হলে ওরকম না করে এরকম করে করতাম....'

বাবি ক্লান্ত স্বরে যান্ত্রিক সুরে ধারাবিবরণী দিয়ে যায়। এমনও হয়েছে, মোনালিসার কাছে না গেলেও বানিয়ে বানিয়ে বর্ণনা শোনাতে হয়েছে নন্দিতাকে। বিকলাঙ্গ স্ত্রীর অনুরোধে, অনুনয়ে, বলতে শুরু করল বাবি। মনে দুশ্চিন্তার টাইফুন। তবু বলে চলল, 'প্রথমে আমি বিছানায় গিয়ে বসলাম, তারপর...'

বিবরণী এগিয়ে চলে। বাবি অনুভব করে, চাদরের নিচে নন্দিতা অস্থির ও চঞ্চল হয়ে উঠেছে। জিভে একটা বিস্বাদ অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ে। নন্দিতার চঞ্চলতা উত্তেজনায় উদ্দাম হয়।

হঠাৎই অন্ধকার থেকে একটা আধো আধো বিকৃত কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

'মা-মণি -মা-মণি। আমাল না ঘুম আত্তে না। একা একা ভয় কত্তে।'

ভীষণ চমকে ওঠে ওরা দুজনেই। পাশের অপক্ষাকৃত ছোট শোবার ঘরে ঘুমিয়ে থাকা পাপুর কথাটা দুজনেই ভুলে গিয়েছিল এই মুহূর্তে। হাত বাড়িয়ে বেড সুইচ টিপে নিয়ন আলোটা জ্বালাতে গেল বাবি। কিন্তু অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় নন্দিতার নখালো থাবা কেটে বসল বাবির কব্জিতে। হিসহিস করে বলল 'আলো জ্বেলো না। চুপ করে থাকো। নিজে থেকেই ভয় পেয়ে চলে যাবে।'

বাবির বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। সজোরে হাত ছাড়িয়ে নিল সে। আলো জ্বেলে দিল। অব্যক্ত স্বরে ডুকরে উঠল নন্দিতা।

উজ্জ্বল আলোয় অনুপ্রবেশকারীকে সুস্পষ্ট দেখা গেল।

বছর তেরো বয়স। মাথাটা শরীরের তুলনায় প্রকাণ্ড। চোখও তাই। পুরু ঠোঁটের কোণ ঘেঁষে লালা পড়ছে। পরনে স্লিপিং সুৎট। দুটো হাত দুপাশে ঝুলছে জড়

পদার্থের মতো। খরগোসের মতো সামনের দুটো দাঁত বিজ্ঞাপনের ভঙ্গিতে প্রকাশিত।

শূন্য দৃষ্টি মেলে পাপু আবার বলল, 'বাপি, ঘুম আত্‌তে না। সত্যি বলতি।'

একটা অদ্ভুত যন্ত্রণা মস্তিস্ক থেকে জন্ম নিয়ে তরঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়ল বাবির শরীরের প্রতিটি কোষে।

নন্দিতা নিজের পা দুটোর বিনিময়ে পাপুকে বাঁচিয়েছে! রূঢ় তিক্ত বাস্তবের মতো কথা গুলো আঘাত করল বাবিকে। পলকের জন্য তার মনে হল, ওই বিনিময় পদ্ধতির আদৌ কোন প্রয়োজন ছিল কি না।

বিভিন্ন মানসিক ক্ষত বাবির বুকের ভেতরটা দলে পিষে থেঁতলে দিচ্ছিল, তখনই তার নতুন করে মনে পড়ল মুন্নির অপমানের কথা। ক্রোধ ও হিংস্রতা আবার জায়গা করে নিচ্ছে বাবির হৃদয়ে। সে ভাবছে একটু আগে ফেলে আসা সন্ধ্যার কথা, রাত্রির কথা, মুন্নির কথা……

ছয় □ মিডলটন রো

'মুন্নি, তুমি কিন্তু আজকাল আমার দিকে নজর দাও না।'

অনুযোগকারী বসে আছে খাটের ওপর। দু'হাত দু'পাশে ভর দিয়ে ড্রেসিং টেবিলে প্রসাধনমুক্ত হতে ব্যস্ত মোনালিসাকে আয়না দিয়ে দেখছে। বসবার ঘরে চলন্ত টিভি'তে লোকসঙ্গীত প্রভাবশালী। মোনালিসা আজ অস্বাভাবিক মন্থর। বারবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিজের মুখটা পরখ করছে সামনের কাচের পর্দায়। সম্রাটের সঙ্গে আজকের দুপুরটা ওকে পাগল করে দিয়েছে। পাইয়ে দিয়েছে রক্তের স্বাদ। সত্যিকারের ভালবাসা হয়তো এমনই শক্তিশালী। অপরাজেয়।

রাহু নিয়ত গ্রাসরত চন্দ্রকে। সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু অস্বাভাবিক ঘটনা কি ঘটে না? চন্দ্র কি কখনও প্রতিগ্রাস করতে পারে না কালান্তক রাহুকে? মোনালিসার চোয়ালের রেখা কঠিন হল। অস্থি জাহির করল নিজের উপস্থিতি। আয়না দিয়ে ও চোখ মেলল রাহুর চোখে। বাবির চোখে। নির্ভাজ স্বরে বলল, 'নজর দেবার মতো কি আছে তোমার?'

বাবি চমকে উঠল। দু'হাতের ভর ছেড়ে দিয়ে চাবুকের মতো টান টান হয়ে বসল খাটে। অলস মেজাজ মিলিয়ে গিয়ে আসল বিষাক্ত সাপটা বেরিয়ে এল খোলস ছেড়ে। ফণা তুলল।

'মুন্নি, জিভ ছাড়া তোমার মুখটা ভীষণ বেমানান লাগবে। তাই মত পাল্টালাম।'

সাপ খাট বেয়ে নেমে এল মেঝেতে। এসে দাঁড়াল মোনালিসার ঠিক পেছনে। ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে হাসল, 'এত তেজ কিসের? দেবদূতের সঙ্গে পেরেম হয়েছে? নাকি তরুণ চৌধুরীর পয়সার জোর বেড়েছে?'

দুটো খসখসে হাত পেছন থেকে হাত রাখল মোনালিসার দু'গালে। আদরের পরশ বোলাতে লাগল। এক ঝটকায় সেই জোড়া হাত ঠেলে দিল ও। অবাক হল নিজের এই আকস্মিক বলগাহীন দুঃসাহসে। উঠে দাঁড়াতে গেল মোনালিসা। আর ঠিক তখনই পেছন থেকে বজ্রপাতের মতো চড়টা আছড়ে পড়ল ওর নরম গালে।

ওর পড়ে যাওয়া শরীরটা বাঁ হাতে রুক্ষভাবে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিল বাবি। তারপর ডান হাতে দ্বিতীয় চড় বসিয়ে দিল। টিভির লোকসঙ্গীত হার মানল সেই বিশ্রী শব্দের কাছে। মোনালিসা ছিটকে পড়ল মেঝেতে। ঠোঁটের কোণ ঘন লাল হয়ে গেছে। দু'চোখে ওর ইস্পাতের ফলা ঝিলিক মারছে।

'মুন্নি, যেদিন তোমাদের কেউ ছিল না, সেদিন তোমাকে রাস্তার কুকুরগুলোর হাত থেকে কে বাঁচিয়েছিল, সেটা আজ বোধ হয় তোমার আর মনে পড়ে না। তোমার ছোট ভাইয়ের আজ পথে পথে ভিক্ষে করে বেড়ানোর কথা। কিন্তু সেটা সম্ভবত আমিই হতে দিই নি। স্নেহ-ভালবাসায় তোমাদের যথাসাধ্য সাহায্য করেছি, প্রতিদান চাই নি।

অথচ–'

আহত বাঘিনীর মতো ক্ষিপ্রতায় উঠে দাঁড়িয়েছে মোনালিসা। তারপর চিৎকার করে বলেছে, 'রাস্তার কুকুরগুলোর হাত থেকে তুমি আমাকে বাঁচিয়েছিলে নিজের জন্যে। তোমার চেয়ে নোংরা কুকুর আমি আর দেখি নি।' একটু থেমে বড় শ্বাস টেনে দম নিল, 'আর প্রতিদান? কি প্রতিদান তোমাকে আমি দিনের পর দিন দিয়ে চলেছি, তা তুমি ভালই জানো। আমি একই সঙ্গে আমার ও তরুণের প্রতি তোমার উপকারের ঋণ শোধ দিয়ে গেছি অক্লান্তভাবে। কিন্তু...... কিন্তু আজ আমি আলাদা। আর আমি কাউকে ভয় পাই না!'

বাবির মুখে অজানা অচেনা ভাঁজ পড়ল। চোখ ছোট হল। তার হাত খামচে ধরল মুন্নির শাড়ি। মোনালিসা ছিটকে কাছে চলে এল। বাবি ঝাপটে ধরল ওকে। অসুর-শক্তিতে মিশিয়ে নিল নিজের শরীরে। দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, 'এ ফ্ল্যাট কার? আমার। ওই টিভি কার? আমার। ওই টেপরেকর্ডার, রেডিও, টেলিফোন, ফার্নিচার কার? আমার, সব আমার!'

লালা জড়িয়ে গিয়েছিল বাবির জিভে। শরীরের সাত তারে টঙ্কার শুরু হয়েছে। শুরু হয়েছে কামকেলি রাগের মূর্ছনা।

ঢোক গিলে আবার বলল বাবি, 'আমি না থাকলে না খেতে পেয়ে বারো বছর বয়সেই তুমি মরে যেতে, মুন্নি। আমি তোমাকে বাঁচিয়েছি। তাই, এই শরীর কার? আমার! ঠোঁট, চোখ, নাক, বুক, মুখ সব আমার!' টেনে টেনে হাসল বাবি। যুদ্ধরত মোনালিসার গাল চাটতে শুরু করল, 'মুন্নি...... মুন্নি...... মুন্নি......'

মোনালিসার প্রতিরোধ একে একে শেষ হল। ওর চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। ও ভাবতে লাগল সম্রাটের কথা। সম্রাট, কেন তুমি এলে আমার জীবনে?

হঠাৎই হালকা শীতার্ত হাওয়া গায়ে কাঁটা তুলতেই মোনালিসা বুঝল ও নিরাবরণ হয়েছে। অতীত একযুগ ধরে যে ইতিহাস দৈনিক পুনরাবৃত্তিতে বাঁধা পড়েছে।

ওদের বিজড়িত শরীর দুটো লতিয়ে পড়ল কার্পেটের ওপর। সাপটা ঠাণ্ডা দেহ নিয়ে চলে বেড়াতে লাগল মুন্নির শরীরের ভূগোলে –উপবনে। অবশেষে অরক্ষিত দুর্বলতম স্থানটি বেছে নিয়ে বিষাক্ত ছোবল বসিয়ে দিল। কোন ওঝা এ বিষ নামাতে পারে না। এ বিষ প্রতিষেধকহীন।

এমন সময় ঘরের টেলিফোনটা বাজতে শুরু করল।

সাত ☐ পার্ক স্ট্রীট

রাস্তার চরিত্র এখন ত্রিমাত্রিক : নির্জন, শান্ত ও অন্ধকার। তবে নির্জন কিংবা অন্ধকার না থাকলেও আমার তরফ থেকে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু শান্ত না থাকলেই সেই অশান্তির মধ্যে আমাকে নাক গলাতে হবে। সেটাই আমার কাজ। আর আজ রাতে আমি অপরাজেয়, অসমসাহসী। কারণ আজকের অভিনব দুপুর পারিপার্শ্বিক বিপদ সম্পর্কে আমাকে সংজ্ঞাহীন করে তুলেছে।

মোনালিসার কাছ থেকে সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ফিরে এসেছিলাম অফিসে। অফিস প্রায় খালি। শুধু একজন টাইপিষ্ট ওভারটাইম করার জন্যে তৈরি হয়ে কাগজপত্র টেবিলে নিয়ে বসেছে। আর কাজে ব্যস্ত অপারেশান্স্ ম্যানেজার মনমোহন বোস, বিলাস পাকড়াশি, আর ইনভেষ্টিগেশানের সত্যনাথ চক্রবর্তী। আমাকে দেখেই সত্যদা হেসে বললেন, 'ভায়া কি চাকরি বাকরি ছেড়ে দিবে নাকি?'

আমাকে সপ্রশ্ন হতে দেখে আরও বললেন, 'বড় সাহেব বার তিনেক তোমার খোঁজ করেছেন। তারপর না পেয়ে কি একটা নোট রেখে গেছেন তোমার টেবিলে।'

আমি নিজের টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলাম। ম্যানেজার মনমোহন বোস আরচোখে বার কয়েক মেপে নিয়েছেন আমাকে। ভারিক্কি গোলগাল চেহারা। মুখ দেখে মনের ভাব বোঝা যায় না। যেহেতু আমি, বিলাস পাকড়াশি ও অবিনাশ দত্ত রোজ নাইট ডিউটি করি, সেহেতু দিনের বেলা অফিসে বসে যথেষ্ট স্বাধীনতা পাই আমরা। সুতরাং ওপর ওয়ালাদের তেমন গুরুতর ভয়ার্ত চোখে দেখি না।

টেবিলে বসে ইংরেজিতে টাইপ করা সংক্ষিপ্ত নোটটা পড়লাম। তার সারমর্ম হল, গতকালের তিন রাউণ্ড গুলি চালানো নিয়ে লালবাজারের সঙ্গে খুব অপ্রীতিকর আলোচনা হয়ে গেছে সিবির। তাঁর জবাবদিহিতে ওরা তো সন্তুষ্ট হয়ই নি, বরং বলে গেছে, আমার মতো একটা কাণ্ডজ্ঞানহীন লোককে এ-বি-সিতে পুষছি কেন; সিবি কি জানেন না, পুলিশে থাকাকালীন কি ধরনের বাজে রেকর্ড আমার ছিল? সুতরাং, অনেক আলোচনার পর সিবি নিরুপায় হয়ে ওদের প্রস্তাবে রাজি হয়েছেন যে আমাকে রাতের টহলে বেশ কয়েকদিন আর কোন আগ্নেয়াস্ত্র দেওয়া হবে না। কারণ পুলিশের চোখে আমি বিপজ্জনক।

নোট পড়া শেষ হতেই আমি তাকালাম মনমোহন বোসের দিকে। উনিও আমার দিকে দেখছিলেন। হয়তো প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছিলেন। বললেন, 'সেন তুমি বরং আজ রাতে টহলে বেরিও না। ক'টা দিন ছুটি নাও। আমি দত্তকে আজ থেকে তোমার জায়গায় দিয়ে দিয়েছি।'

বুঝলাম বোস সাহেবও আমার কার্যকলাপকে খুব একটা ভাল চোখে দেখছেন না। না দেখাটাই স্বাভাবিক। কারণ কোম্পানি হয়তো আমার জন্যে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ঠিক করলাম, আজ রাতে তাহলে আর ডিউটিতে যাব না। মোনালিসার কথা ভেবেই কাটিয়ে দেব। এই মুহূর্তে খুব ইচ্ছে করছে ওর সঙ্গে কথা বলতে। এখন অফিস প্রায় খালি, সুতরাং এখান থেকেই একবার ফোন করে দেখা যাক। মোনালিসার ফোন নম্বর আজ জেনে নিয়েছি ওর কাছ থেকে।

নোটটাকে দুমড়ে বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিলাম। তারপর রিসিভার তুলে নিয়ে কাগজের টুকরোয় লেখা ফোন নম্বর দেখে ডায়াল করতে শুরু করলাম। মোনালিসা এখন কি করছে কে জানে। আমার কথা ভাবছে না তো।

ওপ্রান্তে টেলিফোন বেজেই চলল, বেজেই চলল। আর আমার মুখ ক্রমশ থমথমে হয়ে উঠল। ওর কোন বিপদ হয় নি তো? ফোন নামিয়ে রেখে দ্বিতীয়বার ডায়াল করলাম। ওপ্রান্ত নিরুত্তর। তৃতীয়বার। ফলাফল একই।

যখন মনমোহন বোসের দিকে ঘুরে তাকালাম, তখন বিলাস পাকড়াশি অফিস ছেড়ে বেরোতে যাচ্ছিল, হয়তো আমার মুখের চেহারা দেখেই থমকে গেল। বলল, 'সেন, কি ব্যাপার? এনি প্রব্লেম?'

আমি বললাম, 'না, কিছু নয়।' তারপর ম্যানেজারের দিকে ফিরে, 'বোস সাহেব, আমি রাতে বেরোব.। রিভলবারের কোন প্রয়োজন নেই।'

বিলাস পাকড়াশি ও মনমোহন বোসের অবাক দৃষ্টির সামনে দিয়ে আমি রওনা হলাম ভেতরে আর্মস সেকশানের দিকে।

দরজা বন্ধ। তালা লাগানো। রামকৃপাল নিজের কর্তব্য শেষ করে চলে গেছে। সুতরাং ঢুকে পড়লাম আর-আর সেকশানে।

ঘরটা পুরোন নথিপত্রে বোঝাই। ফলে ধুলো এবং আরশোলা এই রাজত্বকে নিজেদের সুবিধে মতো ভাগাভাগি করে নিয়েছে। ঘরের একটা কোণ হয়তো সেই কারণে পরিণত হয়েছে অপ্রয়োজনীয় জিনিসের ভাঁড়ারে। লোহার ফ্রেম, কাঠের বাটাম, ভাঙা চেয়ার, টুকিটাকি সবই এখানে আছে। নির্বিচারে ধুলোময় জিনিসগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করে চললাম। ঈপ্সিত বস্তু পেলাম মিনিট খানেকের মধ্যেই। হাত তিনেক লম্বা একটা বীভৎস মরচে পড়া লোহার রড। ইঞ্চি আড়াই মোটা। মাথাটা ক্রমশ সরু হয়ে শেষ প্রান্তে গিয়ে ইঞ্চি দেড়েকে দাঁড়িয়েছে। হয়তো কোন কালে

ঢালাইয়ের কাজে উদ্বৃত্ত থেকে গেছে। সেটা তুলে নিয়ে মুছে নিলাম। ওজনটা পরখ করে দেখলাম। দু-তিন কেজি হবে। হয়তো একটু বেশিই, কিন্তু আমি নিরুপায়। কিছু কাপড় ও দড়ি জোগাড় করে রডের সরু মাথাটায় হাতলের মতো মাপে শক্ত করে জড়িয়ে নিলাম। তারপর সেটা হাতে করে বেরিয়ে এলাম বাইরের অফিসে।

বিলাস পাকড়াশি চলে গেছে। সত্যদা যাওয়ার উপক্রম করছেন। আর বোস সাহেব এখনও কাজে ব্যস্ত। কিন্তু আমাকে বিচিত্র অস্ত্রে সজ্জিত দেখে উনি হতবাক হয় গেলেন। আমি ওঁর টেবিলের ওপর থেকে মরিস মাইনরের চাবিটা তুলে নিয়ে বললাম, 'আর আপনাদের লালবাজারে জবাবদিহি করতে হবে না।'

• বোস সাহেব কোন উত্তর দিলেন না।

সত্যনাথ আমাকে কাছে ডাকলেন। বললেন, 'ভায়া, মাথা গরম কোরো না। এই জন্যেই তুমি পুলিশের চাকরিতে টিকতে পারো নি।'

আমি হেসে বললাম, 'সত্যদা, আমি কিন্তু একটুও মাথা গরম করি নি। কোম্পানীর কাজ আমি ভালবাসি, তাই রাতে বেরোচ্ছি। আর......' একটু থেমে, 'আপনাদের উপদেশ দেবার কথা, আপনারা দেবেন। আমার এক কান দিয়ে শুনে আর এক কান দিয়ে বের করে দেবার কথা, তাই দিচ্ছি।'

সত্যনাথ গম্ভীর হয়ে গেলেন। ওঁর চোখের দৃষ্টিটা আমার পছন্দ হল না একটুও। তারপর উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি অফিস ছেড়ে। মোনালিসা এখন কেমন আছে, ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছে। মনে মনে ঠিক করেছি, টহলে বেরিয়ে ওর জানালায় উঁকি দেব রাস্তা থেকে। দূর থেকে ছুঁড়ে দেব আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছা।

এখন সেই ইচ্ছেই রূপায়িত হল কার্যে। আমার গাড়ি শব্দহীন ভাবে ঢুকে পড়েছে মিডলটন রো'তে। গাড়ি থামিয়ে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে উঁকি মারলাম চারতলার বিশেষ ঘরটা লক্ষ্য করে। রাত এখন প্রায় এগারোটা, কিন্তু মোনালিসার ঘরে আলো জ্বলছে। দুটো ঘরেই। নিশ্চয়ই ও নিরাপদে আছে। গাড়ি থেকে নেমে বাড়িটার প্রাচীন সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠার এক দুর্দম ইচ্ছে আমাকে পেয়ে বসল। চার তলার কম্পমানসী আমাকে সূর্যমন্দিরের চুম্বকের মতো টানছে। আর আমি এক অসহায় জাহাজ। চুম্বক-সংঘর্ষে চূর্ণবিচূর্ণ হওয়াতেই যার চরম তৃপ্তি। কিন্তু দাঁতে ঠোঁট চেপে আমি বসে রইলাম। ভাবতে লাগলাম এ-বি-সির আপ্তবাক্য: মিশন ফার্স্ট, মিশন লাস্ট। এবং অসীম শক্তি সঞ্চয় করে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে এলাম পার্ক স্ট্রীটে। শুরু করলাম রাতের টহল। আজও গাড়িতে আমরা দুজন। আমি ও বীভৎস লোহার রডটা। পেছনের সীটে ওটা নিরীহভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে শুয়ে রয়েছে। প্রয়োজনে সাফল্যের সঙ্গে কর্মশীল হবে আশা করি।

ঘটনাটা আমার অনেকক্ষণ ধরে চোখে পড়লেও, খেয়াল হল অনেক পরে। যত রাত বাড়ছে, রাস্তার প্রাইভেট কার ও ট্যাক্সির সংখ্যা ততই কমে আসছে সমানুপাতে। কিন্তু একটা বিশেষ ফিয়াট গাড়িকে মনে হল আমি যেন বিভিন্ন জায়গায় দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি। কখনো ক্যামাক স্ট্রীটে। কখনও পার্ক হোটেলের সামনে। কখনও ফ্লুরির্জের দরজায়। প্রথমে শুধু তার রংটাই চোখ টেনেছিল। কালো। এখন নম্বরটাও।

সুতরাং সচেতন হওয়ার পর ফিয়াট গাড়িটাকে আমি এ-বি-সির ক্লায়েন্টের লিস্টে ঢুকিয়ে নিলাম। বন্ধ দোকানপাট ছাড়াও ওটার দিকে নজর রাখতে লাগলাম।

নজরে নজরে দৃষ্টি ক্লান্ত হল। সময় বয়ে গেল অনেক। তখন শুধু আমাদের দুটো গাড়িই পৌনঃপুনিকতায় পার্ক স্ট্রীট ও ক্যামাক স্ট্রীটে ঘোরাফেরা করছে। মনে পড়ল অপারেশান্স্ ম্যানেজার বোস সাহেবের কথা : অবিনাশ দত্ত আজ থেকে আমার এলাকায় টহল দেবে। তাহলে কালো ফিয়াট গাড়িতে অবিনাশ দত্ত বসে নেই তো? আমাদের কোম্পানির গাড়ি চেনার উপায় নেই। বেশির ভাগ গাড়িই ভাড়ায় নেওয়া হয় এবং দ্রুত তাদের চেহারা ও চরিত্র বদল হয়। সম্ভবত এই ফিয়াট গাড়িটা নতুন, ফলে অচেনা।

আমাদের এই ঘোরাফেরা ও লুকোচুরি চলাকালীনই একটা অদ্ভুত দৃশ্য আমার চোখে আটকে গেল।

পার্ক স্ট্রীট পোষ্ট অফিসের পাশেই বিশাল এক ফটোগ্রাফির দোকান 'ক্লোজ-আপ'। এই দোকান আমাদের সুরক্ষা-তালিকায় নথিভুক্ত। দোকানের সামনে বিরাট কাচের শো-কেস। তাতে কোডাক কোম্পানির কয়েকটা প্রচার-চিত্র সাজানো। এছাড়াও কয়েকটা ক্যামেরা ও ফ্ল্যাশগান চোখে পড়ে। দোকানের দরজা ফুট পাঁচেক চওড়া, রোলিং শাটারে বন্ধ। শাটারের ওপরে আগফা কোম্পানির বিজ্ঞাপন। কিন্তু শো-কেসটা অরক্ষিত, এবং কাচের দেওয়াল পেরিয়ে দোকানের ভেতরটা মোটামুটি দেখা যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় দোকানের ভেতর ও বাইরেটা অন্ধকার থাকে। ফুটপাথের কিনারায় বিশাল ঘন পাতার গাছ দাঁড়িয়ে থাকায়, রাস্তার ভেপার ল্যাম্পের আলো যতটা উচিত ততটা পৌঁছয় না। এখন সেই স্বাভাবিক পরিস্থিতি অস্বাভাবিক। কারণ দোকানের শো-কেসটা ভাঙা। ভেতরে একটা তীব্র অথচ শীর্ণ রশ্মি সপ্রাণভাবে চলাফেরা করছে। আর তৃতীয়ত, কোন কিছু ভাঙচুরের আবছা শব্দ পাওয়া যাচ্ছে অভ্যন্তর থেকে। সম্ভবত ;ক্লোজ-আপ'কে কেউ ক্লোজ ডাউন করতে চলেছে।

টহল দেবার সময় আমরা মাঝে মাঝে ফুটপাথের ধার ঘেঁষে গাড়ি পার্ক করে পাঁচ-দশ মিনিটের বিশ্রাম নিই। এখন সেরকমই বিশ্রাম নিচ্ছিলাম ক্যামাক স্ট্রীটের

কোণে এয়ার কণ্ডিশনড মার্কেটের সামনে। তখনই ভাঙা কাচের ওপর আলোর ঝলকানিটা আমার নজরে পড়ে।

গাড়িটা চুপিসারে নিয়ে এসে পার্ক করেছি রঙ সাইডে, পোষ্ট অফিসের সামনে। গাড়ি থেকে নেমে পড়েছি। লোহার রডটা তুলে নিয়েছি শক্ত হাতে। তারপর পা টিপে টিপে গিয়ে দাঁড়িয়েছি ভাঙা কাচের সামনে। এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে ঢুকে পড়লাম ভেতরে।

দোকানের ভেতরে উষ্ণতা অনেক বেশি। শব্দও। কারণ যে দুরন্ত গতিতে জিনিসপত্র ভাঙচুর হচ্ছে, তাতে শব্দের পরিমাণ এরকমটা হওয়াই স্বাভাবিক। এবং শব্দগুলো আসছে ভেতরের কোন ঘর থেকে।

শো-কেস ডিঙিয়ে ঢুকতেই সেলস কাউন্টার। তার পেছনে স্টুডিও। অকুস্থল সেটাই। নিজেকে আড়াল রেখে উঁকি মারলাম ভেতরে। অনুপ্রবেশকারী দু'হাতে সযত্নে ক্রিয়াশীল। টর্চলাইট একটা রয়েছে। সেটা জ্বলন্ত অবস্থায় একটা টুলের ওপর রাখা আছে। আর সে দু'হাতে প্রতিটি মূল্যবান জিনিস মাথার ওপরে তুলে আছাড় মারছে পায়ের কাছে। ক্যামেরা, হাই পাওয়ারের ল্যাম্প, আর্ক ল্যাম্প, স্ট্যাণ্ড, ফ্ল্যাশগান, এনলার্জার –সব। তারপর বুটসমেত পায়ের নিষ্ঠুর চাপে গুড়িয়ে দিচ্ছে যথাসম্ভব। আলোছায়ার মধ্যে ডুবে থাকা লোকটা কি খোঁড়াচ্ছে? কাল রাতে একেই কি আমি গুলি করেছিলাম? অত চিন্তার সময় নেই। ক্লায়েন্টের স্বার্থ রক্ষায় আমি সরাসরি লোকটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। তখন সে একটা আর্ক ল্যাম্প মাথার ওপরে তুলে ধরেছে আছাড় মারতে। আমাকে দেখে যেন ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। ল্যাম্পটা ছেড়ে দিয়ে ডান হাতটা ছুটে গেল প্যান্টের পকেট লক্ষ্য করে। কিন্তু আমি আর দেরি করলাম না। প্রচণ্ড কৌণিক গতিবেগে বৃত্তাকার পথে লোহার রডটাকে দু'হাতে ঘুরিয়ে বিপুল ভরবেগ সঞ্চয় করে বসিয়ে দিলাম লোকটার কোমরে। এটা হল কালকের প্রথম লাথিটার বিনিময়ে। লোকটা শরীর ঝাঁকুনি খেয়ে সামনে দু'হাত এগিয়ে গেল। রড ও দেহের সংঘর্ষের ভোঁতা শব্দের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অস্ফুট যন্ত্রণায় চিৎকার বেরিয়ে এল তার গলা চিরে। আমি রডটা তুলে নিয়ে এবারে আঘাত করলাম বুকের ওপর। দ্বিতীয় লাথির শোধ। ফলাফল হল প্রথম আঘাতের মতই, তবে এবারে লোকটা মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে ছিটকে গেল পেছনে। পড়ে গেল ভাঙা জিনিসপত্রের ওপর। সেকেণ্ড কয়েক স্থায়ী অগোছালো শব্দ হল একটা। হাঁফাতে হাঁফাতে আমি জ্বলন্ত টর্চটা তুলে নিলাম টুলের ওপর থেকে। খুঁজতে লাগলাম আলোর সুইচ। খুঁজে পেলাম। আলো জ্বেলে দিলাম। এবারে লোকটাকে প্রয়োজন মাফিক জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে । যদি অবশ্য সে কথা বলতে পারার মতো শারীরিক অবস্থায় থাকে।

কিন্তু আমি ঘুরে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই অবিনাশ দত্ত লোকটার কপালে গুলি করল।

চাপা কালো প্যান্ট। ছাপা টেরিকটনের শার্ট। ঝাঁকড়া চুল। বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। চাপ দাড়ি। সৌখিন গোঁফ এবং ধূমায়িত আগ্নেয়াস্ত্র। সব মিলিয়ে এই হল অবিনাশ দত্ত। মধ্য কলকাতায় এ-বি-সির নৈশ অপারেটর। এখন দু'পা ফাঁক করে যুদ্ধের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। স্বাস্থ্য ফেটে পড়ছে অহঙ্কারে। কারণ এই মাত্র অচেনা আক্রমণকারীর হাত থেকে সে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে।

'গুলি করলেন কেন, দত্ত?' আমি আহত গলায় জিজ্ঞেস করলাম। একটা উজ্জ্বল সূত্র নিভে গেল একটা গুলিতে। হয়তো এই লোকটার কাছ থেকে ওদের গোটা দলটার সন্ধান পাওয়া যেত। জানা যেত দামী জিনিসপত্রগুলো চুরি না করে সে ভাঙচুর করছিল কেন। কিন্তু এখন সব শেষ।

অবিনাশ দত্ত অস্বস্তির ভঙ্গিতে হাসল। বলল, 'সেন, লোকটার ডান হাতটা খেয়াল করেছ ? ও কোন অস্ত্র বের করতে যাচ্ছিল। তোমাকে অ্যাটাক করত–'

আমি লোহার রডটা উঁচিয়ে দেখালাম। বললাম, 'এটার বাড়ি খাওয়ার পরেও?'

কারণ আমি জানি, গুলিটা যখন কপালে লাগে, তখন আততায়ী নিশ্চত অজ্ঞান হয়ে গেছে রডের আঘাতে। এগিয়ে গেলাম শিথিল মৃতদেহটার দিকে। রক্তে মুখ ভেসে গেছে। ফলে অবয়ব চেনা যায় না। চেহারা দেখে মনে হয়, বয়েস চল্লিশের এ- পিঠেই। পোশাক-আশাক অপরিস্কার ও জীর্ণ। চোখদুটো বিস্ময়াহত।

আমি দোকানের টেলিফোনটা খুঁজে বের করলাম। লালবাজারে খবর দিতে যাব, অবিনাশ দত্ত এগিয়ে এল কাছে। বলল, 'রিসিভারটা আমাকে দাও। আজ অফিসিয়ালি এই এলাকায় আমার টহলদারি পড়েছে। তোমার কথা জানতে পারলে পুলিশ জল ঘোলা করতে পারে। তাছাড়া ওটার ব্যাপারেও....' অবিনাশ দত্ত আঙুল তুলে আমার হাতের অস্ত্রটা দেখালো, 'তুমি বরং চলে যাও, আমি সব দেখছি। দোকানের মালিককে খবরটা দিয়ে আগামীকাল আমাদের অফিসে আসতে বলব। তখন ইচ্ছে হলে তুমি কথা বোলো।'

রাজি হলাম। কর্মগত কারণে অবিনাশ দত্তের সঙ্গে আমার প্রচ্ছন্ন রেষারেষি থাকলেও এই মুহূর্তে সে যেন আমার সব চেয়ে বড় বন্ধু। বিদায় নিয়ে রাস্তার দিকে রওনা হলাম। ভাঙা শো-কেস দিয়ে বাইরের রাস্তায় দাঁড় করানো দত্তর কালো ফিয়াট গাড়িটা বেশ ভাল করেই চোখে পড়ছে। বেরোতে গিয়েও কি একটা মনে হতে থমকে দাঁড়ালাম। ফিরে এলাম স্টুডিওর ভেতরে। সোজা এগিয়ে গেলাম নিহত তস্কর-চূড়ামণির দিকে। ঝুঁকে পড়ে তার ডান হাতটা দেখলাম। শরীরে লাগোয়া

পকেটের কাছাকাছি পড়ে আছে। অবিনাশ দত্ত তখন টেলিফোনে কথা বলতে বলতে ও সামান্য বিস্মিত ভঙ্গিতে আমাকে দেখছে। আমি এবার মনোযোগ দিয়েছি লোকটার জামা প্যান্টের পকেটের দিকে। এবং পরীক্ষা সফল হল। একটা নল-কাটা শর্টগান পাওয়া গেল তার প্যান্টের পকেটে। তাতে গুলি ভরা। বন্দুকটা আবার পকেটে গুঁজে দিয়ে রওনা হলাম ভাঙা শো-কেসের দিকে। আমার ভুরুতে ভাঁজ পড়েছে। মন বিষিয়ে উঠেছে। যেতে যেতে দত্তকে লক্ষ্য করে বললাম, 'ওই বিপদের মুহূর্তে লোকটা বোধ হয় ভুলে গিয়েছিল সে ন্যাটা। কারণ বন্দুকটা দেখলাম ওর বাঁ পকেটে রয়েছে।' একটু থেমে আরও বললাম, 'শুধু শুধুই আপনার গুলিটা খরচ করলেন।'

'নিয়তি কে রুখতে পারে?' উত্তর পেলাম।

চলে যাওয়ার মুহূর্তে জুনিও এই একই কথা বলেছিল। ওর চোখ সিক্ত, রক্তাক্ত। ঠোঁট ফোলা। গলা বুজে এসেছে। তবু জড়ানো গলায় ডুকরে উঠে বলেছে, 'আমি যাচ্ছি। নিয়তি কে রুখতে পারে?...... জানো, সবচেয়ে অবাক লাগছে, এই ছেড়ে যাওয়ার মুহূর্তেও তোমাকে আমি ভালবেসে চলেছি; আমি নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছি, সম্রাট। তুমি আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু আবার তুমিই আমার সবচেয়ে ভয়ঙ্কর শত্রু। আমি যে কি করি......' ওর কান্নার ঢলে প্রকৃতি ডুবে গেছে। সেই সঙ্গে আমিও।

দোকানের বাইরে ঘন রাতের কোলে বেরিয়ে এলাম। আত্মসমর্পণ করলাম চাঁদের আলোর কাছে। বললাম, আমায় বন্দী করো......

আট ☐ হসপিটাল রোড

আমার সামনে সূর্য, আর ডান পাশে অঙ্গাঙ্গী উজ্জ্বল চাঁদ : মোনালিসা। মাথার ওপরেও চাঁদ আর একটা রয়েছে, তবে সে তুলনায় দীন হীন মলিন এবং পশ্চিমের আকাশে সূর্যদেবের আসন্ন ইচ্ছামৃত্যুর কারণেই দৃশ্যমান। আমার পাশটিতে যে চাঁদ শরীর এলিয়ে বসে আছে, সে সূর্যকে ভয় পায় না। কাউকে না।

আমাদের মাথার ওপরে সবুজ, চারপাশে সবুজ, মনেও সবুজ। সবুজে সবুজে আমরা ক্রীতদাসের মতো শৃঙ্খলিত। সামনেই মসৃণ রাস্তা। রাস্তা পেরিয়ে রেসকোর্স। এখন গোধুলি আলোয় সেই বিশাল শূন্য মাঠে এক অদ্ভুত ট্র্যাজেডি চেতনা ভেসে বেড়াচ্ছে অদৃশ্য কুয়াশার মতো । ঘরমুখো পাখিরা গুঞ্জরনে ব্যস্ত। ছুটে যায় জ্বলন্ত হেডলাইট নিয়ে কোন গাড়ি। কদাচিত হেঁটে যায় কোন শ্রান্ত পথিক।

'সম্রাট……' মোনালিসা কথা বলে অস্ফুটে, 'সব রকম বিপদে তুমি নিজেকে জড়িয়ে ফেলো কেন?'

আমি ওর দিকে তাকালাম। ছায়া ছায়া আঁধারে ও অস্পষ্ট। শুধু নাকের নথ চিকচিক করছে। জানি, ও গতকাল রাতের কথা বলতে চাইছে। কারণ ওকে একটু আগেই সব খুলে বলেছি, আর তখনই জেনেছি কিছু কিছু নতুন কথা। বিচ্ছিন্ন। অস্ফুট।

আজ সকালে অফিসে ঢুকতেই সিবির মুখোমুখি হয়েছি। অবিনাশ দত্ত, বিলাস পাকড়াশি ও নৃপতি বোস সিবিকে ঘিরে বাইরের ঘরে দাঁড়িয়ে। উত্তেজিতভাবে কিছু একটা বলছিলেন সিবি, আমাকে ঢুকতে দেখেই বললেন, 'সেন, আমার ঘরে চলো, কথা আছে। মিষ্টার দত্ত, আপনিও আসুন।' শেষের কথাটুকু অবিনাশ দত্তকে লক্ষ্য করে। স্পষ্টই বুঝলাম গতরাতের চাঞ্চল্যকর ঘটনা নিয়ে এখন আমাদের আলোচনা হবে। হোক, আমার আপত্তি নেই। সুতরাং আমরা দুজনে অনুসরণ করলাম সিবিকে।

সিবি প্রথমেই আমাকে স্নেহময় তিরস্কার করেছেন অস্ত্রহীন ভাবে উপযাচক হয়ে টহলে বেরোনোর জন্য। উত্তরে অবিনাশ দত্ত সামান্য রুক্ষভাবেই বলেছে, 'না, সেন নিরস্ত্র ছিল না। ওর হাতে এক প্রকাণ্ড লোহার রড ছিল।' রডটা আমি আবার

ফিরিয়ে রেখেছি আর আর সেকশানে।

আমি মিষ্টি করে হাসলাম। বললাম, 'সিবি, ভারতবর্ষের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে আত্মরক্ষার ষোলো আনা অধিকার আমার রয়েছে। তাছাড়া, ওঁর চেহারা দশাসই –খালি হাতে থেকেও নিজেকে সুরক্ষিত বলে ভাবতে পারেন–' আঙুল তুলে অবিনাশ দত্তর দিকে দেখালাম। দত্ত এবার হেসে ফেলল, 'কিন্তু আমি, দুর্বল সম্রাট সেন, পুলিশে চাকরি করার ফলে যার শত্রু সংখ্যা আকাশের তারার মতই অগুণতি, নিজেকে নিরস্ত্র অবস্থায় রাখতে বড় অস্বস্তি বোধ করি। আমাকে ক্ষমা করুন এই অক্ষমতার জন্য।' মাথা ঝোঁকালাম অভিবাদনের ভঙ্গিতে।

সিবি হালকা চালে হাত নাড়লেন। বললেন, 'এবার কাজের কথা শোন। লালবাজার অলরেডি কেসটা টেকআপ করেছে। তদন্তে জানা গেছে, মৃত চোরটি হচ্ছে মল্লিকবাজার অঞ্চলের এক দাগী গুণ্ডা। ভাঙচুর কেন সে করছিল, তার কারণ এখনও তারা জানতে পারে নি। আর ঘটনাস্থলে তুমি যে হাজির ছিলে, সেকথা আমরা পুরোপুরি চেপে গেছি। বলেছি, শুধু দত্তই প্রেজেন্ট ছিল–'

আমি অবিনাশ দত্তর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম। হাতে হাত মিলল। রুক্ষ কর্কশ ও শক্তিময় অনুভূতি। বললাম ওকে 'ধন্যবাদ। প্রাণ ও পুলিশী ঝামেলা থেকে বাঁচানোর জন্যে। কারণ পুলিশ মহলের বড়কর্তারা কেউই আমাকে পছন্দ করেন না।'

'ফরগেট ইট, সেন।' অবিনাশ কাঁধ ঝাঁকালো। ওর জামার নীচে কেঁপে উঠল পেশীবহুল বুক। জানান দিল, আমরা আছি।

সিবি আবার আলোচনার খেই ধরলেন, 'দোকানের মালিকের নাম তরুণ চৌধুরী। ক্যামাক স্ট্রীটে থাকে। টেলিফোনে জেনেছি, সে লালবাজারে গিয়ে এজাহার ইত্যাদি সেরে ফেলেছে। এখন আসবে আমাদের এখানেই। কথা বলার সময় ইচ্ছে করলে তোমরা দুজনেই থাকতে পারো।'

আমরা নীরব সম্মতি জানিয়েছি।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হরিচরণ এসে খবর দিল, তরুণ চৌধুরী দেখা করতে এসেছেন।

আগন্তককে দেখে আমি প্রথাগত ভঙ্গিতে চমকে উঠলাম। দাঁড়িয়ে পড়লাম চেয়ার ছেড়ে। লোকটার চেহারা ছিপছিপে। চোখে পুরু লেন্সের চশমা। চলাফেরায় ভীষণ ইতস্তত ভাব। ফর্সা লম্বাটে মুখ। দাঁত দিয়ে ঠোঁটের কোণ ঘন ঘন কামড়ে ধরছে। ঝটকা মেরে ঘাড় ফিরিয়ে ক্রমান্বয়ে দেখছে আমাদের তিনজনের দিকে।

আমি সরাসরি তার চোখে চোখ রেখেছি একটা কথা জানতে : সে আমাকে চিনতে পেরেছে কি না। প্রায় আট সেকেণ্ড আমাদের স্থিরদৃষ্টি পরীক্ষা চলল। না, সে

চিনতে পারে নি আমাকে। বুঝলাম, সেই রাতে মোনালিসার ফ্ল্যাটে ওঠার সিঁড়িতে যে সংঘর্ষ আমাদের হয়েছিল, সেটা তরুণ চৌধুরীর কাছে নিতান্ত অপ্রত্যাশিত হওয়ায় সে আমাকে চিনতে পারে নি। কিন্তু তরুণ চৌধুরী মোনালিসার ফ্ল্যাটে গিয়েছিল কি প্রয়োজনে?

সমগ্র আলোচনায় আমি নীরব রইলাম। সিবি প্রধান বক্তা। অবিনাশ দত্ত বিশেষ বিশেষ সময়ে সিবির কথার প্রতিধ্বনি যন্ত্র।

কথা বলার সময় তরুণ চৌধুরীর অস্বস্তি চরমে উঠল। চোখে মুখে ধরণী-দ্বিধা-হও গোছের অভিব্যক্তি। এই আচরণের কারণ আমার উপস্থিতি কি না বলতে পারি না।

আলোচনায় প্রকাশ পেল, 'ক্লোজ আপ' যথেষ্ট লাভজনক প্রতিষ্ঠান।

কিন্তু গতকালের ঘটনার পর, লাভজনক কেন, দোকানটাকে ক্ষতিজনক বললেও কম বলা হয়। কারণ দোকানটা বীমা করা নেই এবং গতরাতের ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ষাট হাজার টাকা। দু'হাতের ফাঁকে মাথা রেখে হঠাৎই বাচ্চা ছেলের মতো ভেউ ভেউ করে কাঁদতে শুরু করেছে তরুণ চৌধুরী। বলছে ভাঙা গলায়, 'আমি শেষ হয়ে গেলাম-আমি শেষ হয়ে গেলাম……'

অন্য কেউ এ ধরণের আচরণে নিমগ্ন হলে আমি হয়তো মনে মনে মন্তব্য করে বসতাম, 'ছেনালিপনা!' কিন্তু তরুণের স্বরে এমন একটা আর্তি ছিল, যার সঙ্গে বন্যার কবলে কিংবা যুদ্ধের বিধ্বংসী বিভীষিকায় সর্বহারা কোন মানুষের হাহাকারের যথেষ্ট মিল রয়েছে। আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল হঠাৎই এবং ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছি বাইরে। সিবি ও দত্ত খানিকটা অবাক চোখে আমার দিকে তাকাল। আমি ভ্রূক্ষেপহীন ভঙ্গিতে নিস্ক্রান্ত হলাম।

বাইরের ঘরে এসে অফিসটাকে খুঁটিয়ে দেখলাম। সবই স্বাভাবিক। কারণ চুরি, মৃত্যু কিংবা দুর্ঘটনা এ-বি-সি প্রোটেকশনের জীবনযাত্রারই একটা অঙ্গ। লুণ্ঠিত তরুণ চৌধুরী অন্যান্য সহস্র লুণ্ঠিত মানুষের মতই একজন সাধারণ মানুষ। সে কোন বিশেষ গুরুত্ব কোন-রকমেই দাবী করতে পারে না।

রিসেপশানে বসা নমিতার কাছে এগিয়ে গেলাম। সবুজ পাড় লাল সিল্কের শাড়ী। তাতে শান্তির দূত অসংখ্য পারাবতের বিমূর্ত ছবি। যেন বলতে চাইছে, সাদা পয়রার ছবি এঁকে নিলেই শান্তি পাবে। আমাকে দেখে টাইপ মেশিনে ঝুঁকে বসে থাকা নমিতা মুখ তুলল। বলল, 'ডিসটার্বড, বেবি?'

এরকম ঠাট্টা-রসিকতা ও মাঝে মাঝেই করে থাকে আমার সঙ্গে। তবে ভীষণ চাপা গলায়। আমি চিন্তিত মুখে বললাম, 'সরি, নট ইন দ্য মুড। একটা টেলিফোন করব।'

ও বিনা বাক্যব্যয়ে রিসিভার তুলে দিল আমার হাতে।

মোনালিসাকে ফোন করলাম।

ফোন বেজেই চলল অক্লান্ত ভাবে। বিরামহীন যন্ত্রসঙ্গীতে ছন্দপতন ঘটিয়ে কোন মিষ্টি সুরেলা কণ্ঠ বলে উঠল না, 'আমি মোনালিসা বলছি।' কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে টেলিফোন নামিয়ে রাখলাম।

নমিতা অবাক চোখে আমাকে দেখল। বলল, 'মিষ্টার সেন, কি ব্যাপার?'

'ব্যক্তিগত।' ছোট্ট জবাব দিয়ে নিজের সীটে ফিরে গেলাম। আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়ই আজ নমিতার সমস্ত আকর্ষণের প্রচণ্ড অবাধ্য হয়ে পড়েছে। চিন্তাকুল ভাবে চেয়ারে গা এলিয়ে বসতেই এতক্ষণ অধীর কৌতূহলী সত্যনাথ চক্রবর্তী জিজ্ঞেস করলেন, 'ভায়া, কি হয়েছে?'

ফিরে তাকালাম তাঁর দিকে। কৌতূহল চুঁইয়ে পড়ছে দু'চোখ দিয়ে। একমুহূর্ত ভাবলাম, যে উত্তরটা মনে মনে ভেবেছি সেটা বলব কি না। তারপর সিদ্ধান্ত নিয়ে গম্ভীর মুখে বলেই ফেললাম, 'মশার পেটে হাতির বাচ্চা!'

বিলাস পাকড়াশি ও নৃপতি বোস হো হো করে হেসে উঠল।

…… মোনালিসার হাসিতে চমক ভাঙল। ও বলল, 'কি ভাবছ, সম্রাট?'

আমি উত্তর না দিয়ে ওর মাথায় হাত রাখলাম। আলতো করে টেনে নিলাম কাঁধের ওপর। উচ্ছৃঙ্খল চাঁদের আলোর দিকে তাকিয়ে চোখ মেলে নীরব রইলাম। তরুণ চৌধুরী মোনালিসার একমাত্র ভাই। ওর চেয়ে বয়েসে বছর দুয়েকের ছোট। তরুণের আয় মোনালিসার একটা অবলম্বন ছিল। ওরা দুজনে মিলে গড়ে তুলেছিল পরস্পরের মেরুদণ্ড। কিন্তু সেই স্থিতিশীল স্তম্ভকে কেউ চুরমার করে দিয়েছে অকরুণ আঘাতে। একটু আগে যখন মোনালিসার ঠোঁট থেকে প্রস্ফুটিত হল এই তথ্যগুলো, তখন আমি স্থবির হয় গেছি। শুনেছি এক উপকারীর ইতিহাস। যে উপকারী তার উপকারের প্রতিটি অণু-পরমাণুর সমান প্রতিদান চায়। ও বলে নি সেই উপকারীর নাম। আমাকে অধৈর্য উত্তেজনা প্রকাশ করতে দেখে ও হেসে বলেছে, 'ভীষণ ছেলেমানুষ তুমি, সম্রাট।' তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে, 'তুমি যদি সেই উপকারী হতে……' প্রকাশিত হয়েছে দীর্ঘশ্বাস। যে বাতাস সবকিছু বিষণ্ণ করে দেয়। সব আনন্দ-খুশি শুষে নেয় পলকে।

আমার সমস্ত প্রশ্ন ও কৌতূহলের উত্তরে মোনালিসা বারবারই বলেছে, 'আর একটু ধৈর্য ধরো। বলব,আজ রাতেই বলব।'

ঘড়িতে তখন ক'টা বেজেছিল জানি না। বাতাসে শীতের খোঁচা হঠাৎই আরও তীব্র হয়ে উঠতে আমরা সচেতন হয়ে পড়লাম। উঠে দাঁড়ালাম সবুজ আসন ছেড়ে। পায়ে হেঁটে শুরু হল আমাদের পথ চলা। আমি চাই এ পথ অনন্ত হোক। যে পথের

শেষে অপেক্ষারত জরা ও মৃত্যু। আমরা দুই পথচারি হাতে হাত ধরে হেঁটে গিয়ে একদিন আত্মসমর্পণ করব তাদের কাছে। মনে মনে কাতর প্রার্থনা জানালাম উপরওয়ালার কাছে, ঈশ্বর, আমার এই একটা কল্পনা অন্তত সত্যি হোক।'

ঈশ্বর আমাকে প্রবঞ্চিত করেন নি।

ফেরার পথে হঠাৎই নামল বৃষ্টি। অথচ আকাশ কোন রকম অগ্রিম আভাস দেয় নি। এই বৃষ্টি শীতের সমর্থক। শীতকে পাকাপাকি আসন করে দিতে যে প্রায় ফি বছরেই অভিভাবকের মতো দেখা দেয়। আমরা আশ্রয় নিলাম এক গাড়িবারান্দার নিচে। আমাদের নীরব কথোপকথন ক্রমেই বেগবতী হয়ে উঠেছে। ক্ষণস্থায়ী অতিথির মতো বৃষ্টি আকস্মিক ভাবেই আবার বিদায় নিল। আমরা আবার চলতে শুরু করলাম। ভিজে পথঘাট পথচারির অনটনে দুর্ভিক্ষগ্রস্ত।

মোনালিসার বাড়ির কাছে এসে থামলাম। লক্ষ্য করছিলাম, ওর মধ্যে এক অজানা অন্তর্দ্বন্দ্ব ক্রমশ ব্যাপক হয়ে ছুঁয়ে ফেলছে মুখের অভিব্যক্তি। হঠাৎই ও শাড়ির ভাঁজ থেকে লুকোনো একটা ক্যাসেট বের করে তুলে দিল আমার হাতে। থেমে থেমে বলল, 'সম্রাট, আমি নিজের মারণ-ভোমরা তুলে দিচ্ছি তোমার হাতে। এই ক্যাসেটে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে রেকর্ড করা রয়েছে মোনালিসা চৌধুরীর ইতিহাস। আমি জানি, তোমার সঙ্গে আমার হয়তো আর দেখা হবে না। কারণ এই ক্যাসেট বাজিয়ে শোনার পর তোমার স্বপ্ন ভেঙে যাবে, নেশা কেটে যাবে পলকে। কিন্তু তবু'

আমি ক্যাসেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু ও বাধা দিল। বলল,'ফেলো না, তোমার জন্যে অনেক না বলা কথা বলেছি আমি। শুনো, প্লীজ।'

আমার হাত ওর হাতে বন্দী হল। আমার সব কৌতূহলের মৃত্যু হয়েছে এই অনুপলে। কোন নগণ্য ক্যাসেটের বিনিময়ে মোনালিসাকে আমি হারাতে চাই না। কিন্তু ওর কথা যে আমি ফেলতেও পারি না। তখন আমি একান্ত অনুগত ও সম্মোহিত।

ক্যাসেটটা পকেটে রাখলাম। জনহীন পথে দাঁড়িয়ে আগামী সাক্ষাৎকারের প্রতিশ্রুতি নিয়ে বিদায় নিলাম। বুঝলাম, এই মুহূর্তে ওকে দেখতে দেখতে আমি আমার ইন্দ্রিয়ের ওপর সমস্ত অধিকার হারিয়ে ফেলছি। এর অর্থ হয়তো একটাই: সকালের দুশ্চিন্তা আমাকে মুক্তি দিয়েছে।

ও চলে যাবার পরেও অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। মনে সুললিত ভাবনার মিছিল। মিছিলে দেখা যায় কল্পনার নানান রঙে রঙীন অনেক পতাকা! তাদের শ্লোগান একটাই : জীবনের অন্য নাম মোনালিসা চৌধুরী।

হঠাৎই আমার চোখ চলে গেল চারতলার জানালায়। এতক্ষণ কেন যে সেদিকে তাকাই নি সেটাই আশ্চর্য। অবাক নজরে দেখলাম, মোনালিসার ঘরে আলো

জ্বলছে, এবং জানালার ঘষা কাচে কোন পুরুষের বিকৃত কালো ছায়া নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। ধৈর্যচ্যুত ক্ষুব্ধ কোন পশু। কে লোকটা? রহস্যময় বাবি?

ঠিক করলাম, ধর্মতলায় পৌঁছে কোন ওষুধের দোকান থেকে মোনালিসাকে ফোন করব। কারণ এক অজানা দুশ্চিন্তা কুসংস্কারের মতই জাঁকিয়ে বসেছে আমার মনের গভীরে। শুনতে পেলাম পথ চলা এক মাতালের বেসুরো গানের কলি, 'চাঁদ কো কেয়া মালুম চাহ্ তা হ্যায় উসে কোই চকোর...'

পকেটের ওপর হাত রেখে ক্যাসেটটা একবার অনুভব করলাম। তারপর দ্রুতপায়ে রওয়ানা হলাম ধর্মতলা অভিমুখে। তখনই লক্ষ্য করলাম, চারতলার জানালার কাছে দুটো প্রতিদ্বন্দ্বী ছায়া মুখোমুখি হয়েছে।

এ লড়াই কি বাঁচার লড়াই? জানি না।

নয় □ মিডলটন রো

'কোথায় ছিল?' বাঘ যদি কথা বলতে পারত, হয়তো সে এইরকম স্বরেই কথা বলত।

বসবার ঘরের টেবিলে মদের গেলাস, মদের বোতল, সিগারেটের টুকরোয় ঠাসা অ্যাশট্রে। পাশেই কার্পেটের ওপর যুদ্ধক্ষেত্রে মৃতদেহের মতো ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে জুতো, কোট,টাই। মৃতদেহগুলোর মালিক বসে আছে সোফায়। চোখ নেশায় ঝাপসা, ঠোঁটজোড়া চকচকে ও পিচ্ছিল—সম্ভবত মুখের লালায়।

চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলেছে মোনালিসা। ফ্ল্যাটে ঢুকেছে। দরজা বন্ধ করেছে আবার এবং বাঘের মুখোমুখি হয়েছে। যে বাঘ ক্ষুধার্ত, হিংস্র, লোভী ও সুষম স্বাভাবিক চিন্তায় অপারগ।

'কোথায় ছিলে?' মদের গ্লাস অভ্যস্ত হাতে উঠল ঠোঁটের কাছে। চুমুক পড়ল।

বেপরোয়া ঘোড়ার মতো কেসর ফুলিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়াল মোনালিসা। ঠোঁট টিপে শক্ত করল চোয়ালের রেখা। সম্রাট সেন উপস্থিত থাকলে হয়তো লক্ষ্য করত, দা ভিঞ্চির ছবির চারিত্রিক ছকের সঙ্গে ওর তফাৎ ক্রমশ বেড়ে উঠছে। মোনালিসাকে আর চেনা যাচ্ছে না।

অপরাধী নায়িকাকে উত্তরহীণ দেখে গ্লাস নামিয়ে রাখল টেবিলে। তারপর উঠে দাঁড়াল। অচেনা অতিথির মতো শিথিল অনিশ্চিত পা ফেলে মোনালিসার দিকে খানিকটা এগিয়ে গেল বাবি। আবার প্রশ্ন করল, 'কোথায় ছিলে, মুন্নি?' প্রশ্নের কাঠামো ও তীব্রতায় অধিকারীর সুর।

মোনালিসার স্থাণু ভঙ্গিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হল। ও বাবির পাশ কাটিয়ে রওনা হল শোবার ঘরের দিকে। বাবির রাগ জান্তব আক্রোশে ফেটে পড়ল। একটা অদ্ভুত শব্দ করে সে খামচে ধরল পাস কাটিয়ে চলে যাওয়া মোনালিসার গোলাপী শাড়ির প্রান্ত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ঘৃণাকুঞ্চিত মুখে শাড়ির অপর দিকটা ধরে সজোরে হ্যাঁচকা মেরেছে মোনালিসা। মাতাল পুরুষটার ক্ষমতা হয়তো কমে এসেছে, সেই সঙ্গে শক্তিও। কারণ বাবির হাত থেকে ঝটকা মেরে ছুটে গেল শাড়ির আঁচল। সে ছিটকে পড়ে গেল মেঝেতে। অস্পষ্ট গোঙানির শব্দ বেরোলো তার হিংস্র দাঁতের ফাঁক থেকে।

মোনালিসা আবার রওয়ানা হয়েছে শোবার ঘরের দিকে। বাবির উপস্থিতি ওর

অনুভূতিতে কোন আঁচড়ই কাটতে পারছে না আজ। ড্রেসিং টেবিলে পৌঁছে ও খুব স্বাভাবিক ভাবে কানের দুলজোড়া খুলে ড্রয়ারে রাখল। মাথার ক্লিপে হাত পড়তেই আয়নার কাছে বাবিকে ও দেখতে পেল।

জামার বেশ কয়েকটা বোতাম খোলা, চুল এলোমেলো, হাত দুটো গরিলার মতো ঝুলছে দুপাশে। কাছে এগিয়ে এল। বলল ভারী গলায়, 'আমাকে তুমি আর ভালোবাসো না তাহলে? বলো?'

যুদ্ধের আক্রমণাত্মক ঢঙটা সরে গিয়ে এখন প্রাধান্য পেয়েছে সন্ধির সুর। হাঁটু গেড়ে ওর পেছনে এসে বসল।

ক্রমে নির্লিপ্ততার অদ্বিতীয় উদাহরণ হয়ে উঠছে মোনালিসা। ও মাথার ক্লিপ খুলল। আয়নায় নিজেকে দেখল। সম্রাট, সম্রাট, আমি তোমার সম্রাজ্ঞী। কিন্তু, কিন্তু,কাল তুমি আসবে তো? ওই কীটগ্রস্ত ক্যাসেটে আমার জীবনের গ্লানিময় ধারাবিবরণী শোনার পরেও আসবে তো?

ঠিক সেই মুহূর্তে বাবি পেছন থেকে ওকে জাপটে ধরল আবেগময় আশ্লেষে। বলল, 'এখনও তোমার কিসের জোর, মুন্নি? তরুণ চৌধুরীর পয়সার জোর তো আর নেই। তার রুপোর হাবেলী আমি গুঁড়িয়ে পিষে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছি। কেন? শুধু তোমাকে কাছে পাওয়ার জন্যে।' ঘুরে এসে মুন্নির মুখোমুখি হল বাবি, 'এক যুগ ধরে ভালবাসার কি কানাকড়িও দাম নেই? কি তোমাকে দিই নি আমি? সাধ-আহলাদ-অর্থ সব দিয়েছি। তোমার ভাইকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছি নিজের পায়ে। তবু, তবু তুমি আমাকে রোজ রোজ এভাবে ফিরিয়ে দেবে?' ওর দু'কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিল সে। ঠোঁট নিয়ে এল কাছে। ফিসফিস করে বলল, 'আই লাভ য়ু, ডার্লিং।' বাঘের দু'চোখ এখন গাভীর মতো সরল এবং সেই কাচের চোখে জল টলটল করছে।

দু'চোখ তীক্ষ্ণ করে একদলা থুতু শব্দ করে বাবির মুখের ওপর ছিটিয়ে দিল মোনালিসা। ঘেন্নায় ওর ঠোঁট বিকৃত হল। নজর স্থির বাবির বিস্মিত মুখে।

ঘটনার আকস্মিকতায় বাবি হতচকিত, স্তম্ভিত। তার থুতু-মাখা চোখ মুখের হাস্যকর অবস্থা দেখে হঠাৎই হেসে উঠল মোনালিসা। ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের বাঁকা তরোয়াল যেন ঝলসে উঠল! যে মেয়ে যত সুন্দরী, তার বিদ্রূপ বোধ হয় ততটাই ভয়ঙ্কর হয়। এক্ষেত্রেও হল।

খিলখিল হাসিতে ভেঙে পড়া মোনালিসার হাসি আচমকা স্তব্ধ হল বাবির প্রচণ্ড চড়ে। বাবির চোখে অপমানের শিখা লকলক করছে। মদের নেশা অথবা কামনা এখন নির্বাসিত। বাঁ হাতে মুখ মুছে নিল সে। এবং অশ্রু।

চড় মারার সঙ্গে সঙ্গেই কোন অভ্যস্ত যোদ্ধার মতো এক জোরালো ধাক্কায় হাঁটু

গেড়ে বসা বাবিকে ড্রেসিং টেবিলের ওপর ছিটকে ফেলে দিয়েছে মোনালিসা। দ্বিতীয়বার থুতু ছিটিয়েছে তার গায়ে। তারপর উঠে দাঁড়িয়েছে। বলেছে, 'অনেক সহ্য করেছি আর নয়……'

বাবি নিজের পতন সামলাতে দু'দিকে দুটো হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এবং তার ডান হাতে ধরা পড়েছে ড্রেসিং টেবিলের একপাশে রাখা রজনীগন্ধায় শোভিত এক পেতলের ফুলদানি। অপমান, লজ্জা, ঘৃণা, ঈর্ষা, প্রতিহিংসা, সব রকম আবেগ শক্তি পৌঁছে দিল বাবির হাতে। অন্ধ আক্রোশে ফুলদানিটা শক্ত থাবার আঁকড়ে ধরে সে উঠে দাঁড়াল। মোনালিসা তখন চলে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

সুতরাং প্রথম আঘাতটা পড়ল ওর ব্রহ্মতালুতে। দ্বিতীয়, ডান কানের পেছনে। মোনালিসা একটা অপার্থিব চাপা শব্দ করে পা ভেঙে পড়ে গেল মাটিতে। বাবির ঠোঁটের কোণ ফেনিল। মাথার লম্বা লম্বা চুল চলে এসেছে মুখ-চোখের ওপর। ভয়ঙ্কর অমানুষিক উন্মত্ততায় তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম.... অগুণতি আঘাত পরম্পরায় সে বসিয়ে দিল মোনালিসার মাথায়, মুখে, গায়ে।

মিনিট দশেক পরে যখন সে হাঁপিয়ে পড়ল, তখন থামল। মোনালিসার মাথা এখন লালচে কাদায় মাখামাখি এক পিণ্ড। একটা অক্ষত চোখ বাঁ গালের ওপর সরে এসেছে। শরীর নিস্পন্দ-অচঞ্চল এবং অকালমৃত্যু সেখানে শাসনবার গ্রহণ করেছে।

বাবি পুরো দৃশ্যটা কিছুক্ষণ ধরে দেখল। তার চোখে আবার জল এসে গেল হঠাৎই। নিজের বাগানের প্রস্ফুটিত গোলাপ কেউ যদি হঠাৎই ছিঁড়ে ফেলে, পিষে ফেলে পায়ের তলায়, তাহলে বুকের ভেতরে যে যন্ত্রণার সৃষ্টি হয় এ যন্ত্রণা অনেকটা সেই রকম। অশ্রু তার অনিবার্য ফলাফল।

রক্তাক্ত ফুলদানিটা বাবির হাত থেকে খসে পড়ল একসময়। সে অবাক চোখে দেখল রক্তের ছিটে বসানো গোলাপী শাড়িটা। শাড়িতে অর্ধ-আবৃত শরীরটা। হঠাৎই বাবির হাত-পা প্রচণ্ড আক্ষেপে কাঁপতে শুরু করল। সেই অবস্থাতেই বসবার ঘরে ফিরে এল সে। কোট-টাই-জুতো কাঁপা হাতে অতি কষ্টে পরে নিল আবার। মদের গ্লাস ও বোতল তুলে নিয়ে রওনা হল বাথরুমের দিকে।

জলের ঝাপটা দিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে নিল। গ্লাস ও বোতল খালি করে ধুয়ে ফেলল ভাল করে। সাজিয়ে রাখল বাথরুমের তাকে। তারপর শোবার ঘরে ফিরে এসে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পরখ করল, তাকে স্বাভাবিক দেখাচ্ছে কি না। হাত-মুখ ভাল করে মুছে নিয়ে যখন সে বাথরুমের ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাবে বলে রওনা হচ্ছে, ঠিক তখনই শোবার ঘরের টেলিফোনটা বাজতে শুরু করল।

থমকে দাঁড়াল বাবি। কয়েক সেকেণ্ড দ্বিধাগ্রস্ত রইল। তারপর কি ভেবে ফিরে এসে টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিল। শুনল কান পেতে। মাঝে মাঝে আড়চোখে

দেখতে লাগল মোনালিসার মৃতদেহের দিকে।

'হ্যালো, মোনালিসা?' উদগ্রীব প্রশ্ন ছুটে এল পরিবাহী তার বেয়ে।

বাবি নিরুত্তর। শুধু তার ভারী শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। এখনও তার হাঁপানি থামে নি।

'হ্যালো –কে? মোনালিসা?'

বাবি চুপ। কে এই অজানা টেলিফোনকারী পুরুষ? মুন্নির প্রেমিক? নাকি তরুণ?

'হ্যালো–'

ভারী শ্বাস-প্রশ্বাস ওপ্রান্তের আকুল প্রশ্নের একঘেয়ে উত্তর দিয়ে চলল। তারপর একসময় রিসিভার নামিয়ে রাখল বাবি। রওয়ানা হল গোপন সিঁড়ির উদ্দেশ্যে। যাবার আগে মুন্নির দিকে ইচ্ছে করেই সে তাকাল না। আজ তার শোক-দিবস। ক্ষণিকের উত্তেজনায় যেন নিজেকেই চরম শাস্তি দিয়ে ফেলেছে সে। তার মনে পড়ল, এই ঘরে দাঁড়িয়ে এই প্রথম, নন্দিতার কথা।

বাথরুমের খিড়কি দরজা খুলতেই এক ঝলক হিমেল বাতাস বাবিকে অভ্যর্থনা জানাল।

থমথমে ধৈর্যশীল শ্বাসপ্রশ্বাস। এছাড়া কোন শব্দ নেই ওপ্রান্ত থেকে।

তারপর হঠাৎই কেটে গেল টেলিফোনের লাইন। আমার বুকের ভেতর তুষার ধস নামল তৎক্ষণাৎ। একই সঙ্গে শুরু হল শব্দময় ভূমিকম্প। ধ্বক……ধ্বক……ধ্বক……ধ্বক। হৃৎপিণ্ড বেজে চলেছে উন্মত্ত লয়ে। কোথাও প্রলয় শুরু হয়েছে।

ডাক্তারখানা থেকে বেরিয়ে এলাম পলকে। টেলিফোন বাবদ একটা দু'টাকার নোট কাউন্টারের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে ফেরৎ পয়সার জন্যে আর অপেক্ষা করলাম না। মোনালিসাকে এক্ষুণি একবার দেখতে চাই। আমার মনে নানান অশুভ আশঙ্কা ছায়া ফেলেছে। অবুঝ মন কোন রকমেই শান্ত হতে রাজি নয়।

একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেলাম অত রাতেও। এবং রওনা হলাম মিডলটন রো অভিমুখে।

মিনিট সাত-আটের মধ্যেই গন্তব্যে পৌঁছলাম। ভাড়া মিটিয়ে তৎপর পায়ে ঢুকে পড়লাম সেকেলে বাড়ির ভেতরে। দ্রুতগতি চলচ্চিত্রের মতো একতলা, দোতলা, তিনতলা মিলিয়ে গেল পিছনে। এসে উপস্থিত হলাম মোনালিসার ফ্ল্যাটের দরজায়। উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠায় আমি হাঁপাচ্ছি। দরজা বন্ধ। কি আছে ওই বন্ধ দরজার ওপিঠে?

একমুহূর্ত থমকে দাঁড়ালাম। তারপর মনকে প্রস্তুত করে সামনে এগিয়ে গেলাম। নব ঘুরিয়ে চাপ দিলাম দরজায়। প্রত্যাশিত ঘটনাই ঘটল : দরজা খুলল না। অতএব দরজায় একটা টোকা মারলাম। একবার…… দুবার…… তিনবার…… চারবার। উত্তর নেই। সুতরাং দ্বিধা কাটিয়ে প্রচেষ্টার পরবর্তী ধাপে প্রবেশ করলাম : মোনালিসার নাম ধরে ডাকলাম বারকয়েক।

কোন সাড়া নেই তবুও।

অবাক হলাম শততমবার। কারণ রাস্তা থেকে দেখেছি মোনালিসার ফ্ল্যাটে আলো জ্বলছে। কিন্তু দরজায় ধাক্কা দিতে ভয় পেলাম। নিচের তলার ফ্ল্যাটগুলোর কোন বাসিন্দা সচকিত হয়ে হাজির হতে পারে ঘটনাস্থলে। অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে।

অন্ধের মতো যখন কোন পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছি, তখন হঠাৎই মনে পড়ল পেছনের ঘোরানো লোহার সিঁড়িটার কথা। অতএব যথা চিন্তা তথা কাজ। আমি পুনরায় গতিশীল।

এবারের অভ্যর্থনাও প্রত্যাশিত। অর্থাৎ, বাথরুমের পেছনের দরজাটা হাট করে খোলা। শোবার ঘরের আলো ঠিকরে এসে পড়েছে মোজেকের টালি বসানো বাথরুমের পিচ্ছিল মেঝেতে। অন্ধকারের কোন অংশে কল থেকে টপ টপ শব্দে জল পড়ছে অবিরাম। বাথরুমে ঢুকে পড়তেই শীতচারী হাওয়া আমাকে রেহাই দিল। হালকা ভাবে আমার নাকে এল মদের গন্ধ। কেউ কি মদ খাচ্ছে? কে, বাবি মিত্র তো? নাকি……

শোবার ঘরে পা দিতেই মহেঞ্জোদাড়ো হরপ্পার মতো মোনালিসার ধ্বংসাবশেষ আমার নজরে পড়ল। আমি এক আভ্যন্তরীণ বিস্ফোরণে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেলাম পলকে। আমার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, অনুভূতি, বিদ্রোহ করে উঠল একযোগে। চোখ যা দেখল, তা সে বিশ্বাস করল না। মস্তিস্ক যে ইশারা পেল, তা সে জানতে চাইল না। মন যা অনুভব করল, তা সে কল্পনা বলে উড়িয়ে দিতে চাইল। কিন্তু আমার সামনের ভাঙাচোরা শিল্পকলা তো বাস্তব। কোন কালাপাহাড় তাকে ধ্বংস করেছে।

টের পাইনি কখন আমি খুব কাছে এগিয়ে গেছি। মদের গন্ধ মিলিয়ে গিয়ে এখন রক্তের গন্ধ রাজত্ব করছে।

আমি মোনালিসার মুখটা মনে করার চেষ্টা করতে লাগলাম। কারণ এখন আমার সামনে ওর সৌন্দর্যের সূত্রপাত হয়েছে বলতে গেলে গলার কাছ থেকে।

চোখের জল এল অনেক দেরিতে। কারণ ঘটনাকে বিশ্বাস করে উঠতেই তার অনেক দেরি হয়ে গেছে। তারপর অশ্রু ও চিন্তার ধারা একই সঙ্গে আকুল ভাবে বয়ে চলল। তাদের ওপর আমার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। হয়তো এই কারণেই জনি

আমাকে ঠাট্টা করে বলত, সেন্টিমেন্টাল যুবনেতা। আমি কখনও সেকথা অস্বীকার করি নি। আমি যে আবেগ প্রবণ –সে আমার দারুণ অহঙ্কার। কারণ প্রকৃত মানুষের শরীরে মননে যান্ত্রিকতার কোন স্থান নেই। শুধু বিভিন্ন অনুভূতি ও আবেগ বাসা বেঁধে থাকে।

এরপর শুরু হল অনুসন্ধান।

তৃতীয় কোন ব্যক্তি ঘরে উপস্থিত না থাকলেও তার উপস্থিতির বেশ কিছু চিহ্নই নজরে পড়ল। রক্তাক্ত ফুলদানি, বাথরুমে সদ্য ধোওয়া বোতল ও গ্লাস। বসবার ঘরের সোফায় কোন ভারী মানুষের বসার ছাপ। সিগারেটের গন্ধের ফিকে ইশারা। আর টেলিফোনে শোনা ভারী শ্বাস–প্রশ্বাস।

কে ছিল এই ঘরে?

টেলিফোনটা ঠিক তখনই বেজে উঠল আমাকে চমকে দিয়ে।

এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলে নিলাম।

'হ্যালো, কে?'

ভারী শ্বাস–প্রশ্বাসের শব্দ যেন শোঁ শোঁ ডাকে ঝড় তুলল আমার কানে। ও–প্রান্ত আর কোন উত্তর দিল না। আমি চুপ করে শুনতে লাগলাম।

প্রায় দশ সেকেণ্ড আমরা পরস্পরের নিঃশ্বাস–প্রশ্বাসের শব্দ শুনলাম। তারপর ও –প্রান্ত টেলিফোন নামিয়ে রাখল।

আমি ধৈর্যহারা হয়ে নিস্ফল আক্রোশে এঘর থেকে ওঘরে ছুটে বেড়ালাম বারবার। পুঙ্খাক্ষি–পর্যবেক্ষণে খুঁজে চললাম কোন সূত্র। কোন ইঙ্গিত। বিছানা উলটে পালটে তোলপাড় করলাম : পুরোন খবরের কাগজ, মাথার ফিতে, কিছু টাকা, কয়েকটা বাদামী খাম, এসব পাওয়া গেলেও কাজের জিনিস কিছুই পেলাম না। ড্রেসিং টেবিলের সব ক'টা ড্রয়ারও ঘেঁটে ফেললাম, কিন্তু বৃথাই।

উদ্দেশ্য আংশিক সফল হল ষ্টিলের আলমারিটা খুঁজে তন্নতন্ন করার পর।

একটা বড়সড় সৌখিন অ্যালবাম পাওয়া গেল আলমারির তাকে। অ্যালবামটা খুলে ভীষণ অবাক হলাম। ভেতরের পাতাগুলোয় কোন ফটো লাগানো নেই। অথচ কালো কাগজের রঙ ও আঠা দিয়ে লাগানো কর্নারগুলো দেখে বোঝা যায়, অ্যালবামের সব ক'টি পাতাতেই ফটো একসময় লাগানো ছিল।

এই বিচিত্র ঘটনার কার্যকারণ অনুমানের চেষ্টায় অ্যালবামটা রেখে দিয়ে আলমারিটা তন্নতন্ন করে খুঁজতে শুরু করলাম। অবশেষে পেলাম রহস্যের উত্তর।

একটা বড় বাদামী খামে সমস্ত ফটোগুলো পাওয়া গেল তবে তার একটি বাদে বাকিগুলো সব ক'টি কুটি কুটি করে ছেঁড়া। ছেঁড়া ফটোর কুচিতে কখনও দেখা গেল মোনালিসার মুখের অংশ, কখনও প্রকৃতি, কখনও তরুণ চৌধুরী, কখনও

ছোটবেলাকার ছবি-সঙ্গে সম্ভবত আত্মীয়-স্বজন, কখনও অপরিচিত মানুষেরা। কোন ফটোতেই কারো স্পষ্ট মুখাবয়ব ধরা পড়ে নি। তার কারণ দুটো : এক. ফটোগুলো খুব স্পষ্ট নয়; দুই. খুব ছোট ছোট অংশে ছেঁড়া হয়েছে সেগুলো। নিতান্ত জাতক্রোধ না থাকলে এত সময় ও তীব্রতা কেউ অপচয় করতে পারে না। যে ছবিটি অক্ষত, সেটি মোনালিসা চৌধুরীর সম্ভবত মোটামুটি সাম্প্রতিক ছবি। পুরোপুরি অক্ষত অবশ্য বলা যায় না, কারণ পোষ্টকার্ড সাইজের ছবিটা মাঝামাঝি ছিঁড়ে ফেলে আবার সেলোটেপ দিয়ে সযত্নে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ফটোটা ওলটাতেই একটা লেখা চোখে পড়ল : 'মুন্নিকে –বাবি।'

আমার কানের পর্দায় কেউ ঢাক পিটিয়ে বিসর্জনের বাজনা বাজাতে লাগল। এই ছবিতে অজানা-অচেনা বাবির স্পর্শ ও চেতনা লেগে রয়েছে। আমি যেন এই ছবিটা ছুঁয়ে তার খুব কাছাকাছি চলে গেছি।

মোনালিসা একটা কারুকাজ করা শাড়ি পরে মরসুমী ফুল ফোটা এক বাগানে দাঁড়িয়ে। সাদা-কালো ফটো, তবুও ওর অনাবিল সৌন্দর্য প্রকাশে কোন বিঘ্ন ঘটে নি। ও হাসছে। হাতে একটা ফুলের গুচ্ছ। পটভূমিতে এক সেকেলে একতলা বাগানবাড়ি। বাড়ির ছাদের পাঁচিলে খ্রীষ্টিয় ঢঙে একটি ডানাওলা দেবশিশুর মূর্তি খোদাই করা রয়েছে সিমেন্টের ওপর। শিশুর বাঁ দিকের ডানার মাথা কিছুটা ভাঙা, এবং পায়ের কাছে লেখা, ১৯৩০-সম্ভবত বাড়িটা যে বছর তৈরি হয় সেই সালটা দেওয়া রয়েছে।

ছবিটার দিকে তাকিয়ে নেশাগ্রস্তের মতো কিছুক্ষণ বসে রইলাম। তারপর একসময় ওটা ঢুকিয়ে নিলাম পকেটে। আর তখনই হাতে ঠেকল মোনালিসার দেওয়া ক্যাসেটটা। ওটা আস্তে আস্তে বের করে নিলাম। ছেঁড়া ফটোর কুচিতে ভরা খাম আবার আলমারিতে রেখে আলমারি বন্ধ করে দিলাম। আমার চোখ এই সুসজ্জিত বিলাসী ফ্ল্যাটে একটা টেপরেকর্ডারের সন্ধান করে চলল। অবশেষে পেয়েও গেল।

টেপরেকর্ডারটা ছিল বসবার ঘরে। টিভির পাশে। ওটায় লাগানো ক্যাসেটটা খুলে আমার হাতের ক্যাসেটটা লাগিয়ে দিলাম। পাওয়ার 'অন' করে বোতাম টিপে দিলাম। মোনালিসার দেওয়া ফিতে বাজতে শুরু করল। আমি একটা সোফায় বসে উৎকর্ণ হয়ে রইলাম। নগণ্য প্রতীক্ষার শেষে মানসপ্রিয়ার স্বর শোনা গেল। আমাকে সম্বোধন করেই তার আত্মজীবনীর সূত্রপাত।

'সম্রাট, নিশ্চয়ই ঘরে তুমি একা রয়েছ?' হ্যাঁ' একা, ভীষণ একা। 'জানি না, যতটা শক্ত হয়ে নিজের কথা বলতে শুরু করছি, ততটা আস্থা নিয়ে শেষ করতে পারব কিনা। সম্রাট, আমার জীবনের শুরুটা খুব সাধারণ অথচ সুখের······

এক অচেনা কুয়াশার আবরণ ভেদ করে প্রতিটি তথ্য ক্রমে ক্রমে গেঁথে যেতে লাগল আমার মনের ভেতরে। মোনালিসার মা তরুণ চৌধুরীর জন্মের সময় মারা যান। বাবা ছিলেন ব্যবসায়ী। এদেশ থেকে ওদেশ উড়ে বেড়াতেন প্রায়ই। হঠাৎই একদিন ঘটে গেল এক বিমান দুর্ঘটনা। তিনি মারা গেলেন। মোনালিসার বয়স তখন তেরো বছর। মামারা ও কাকারা বিপদে এগিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু যখনই প্রকাশিত হল, মোনালিসার বাবা হিমালয় সদৃশ ঋণ রেখে গেছেন আত্মজ-আত্মজার জন্যে, তখনই তাদের পরোপকারের সংক্রামক ব্যাধি নিরাময় হয়ে গেল আশ্চর্য দ্রুততায়। মোনালিসা ও দশ বছরের ছোট ভাই তরুণ আবার হয়ে পড়ল স্বজনহীন। তখনই কোন দেবদূতের মতো এসে আবির্ভূত হল বাবি। মোনালিসার বাবার ব্যবসায়ী বন্ধু। শুধু ব্যবসা ছাড়াও সামান্য অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল দুজনের মধ্যে। অচল গাড়িকে সচল করল বাবি একা। প্রথমে সে দেনা মেটালো। তারপর অপরিসীম ধৈর্য ও মমতায় মোনালিসা ও তরুণকে মানুষ করতে লাগল। তবে নানান কথায় এটা সে বুঝিয়ে দিত, মোনালিসা ও তরুণকে সে পূর্ণজীবন দিয়েছে। তাদের স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তির সে-ই একমাত্র সত্ত্বাধিকারী।

মোনালিসার যৌবন এল একদিন। প্রেমে পড়তেও দেরি হল না ওর। এবং সেই খবর একদিন বাবির কানে পৌঁছল। আর সেই রাতেই শোধ নিল বাবি। মোনালিসাকে বুঝিয়ে দিল ওর শরীরের ওপর নিঃশর্ত অধিকার কার।

তরুণ চৌধুরী মুখচোরা সরল কিশোর। সে এই দুর্নীতির কথা জেনেও বিদ্রোহ করতে প্যারে নি। সাহস পায় নি। কারণ বাবি বিরূপ হলে তার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাবে। অতএব প্রেম মুছে গেল মোনালিসার জীবন থেকে। বাবি একই ইতিহাসের পৌনঃপুনিক আবর্তন ঘটিয়ে চলল।

কালক্রমে তরুণ চৌধুরী একটি ফোটোগ্রাফির দোকানের মালিক হয়ে প্রতিষ্ঠিত হল জীবনে। কিন্তু সে যেই মোনালিসাকে বাবির কাছ থেকে মুক্ত করতে চেয়েছে, তখনই বাবি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। এমন কি শেষ পর্যন্ত ওর দোকান ধ্বংস করে দিতে চেয়েছে। আর মোনালিসাকে যখের ধনের মতো সর্বদা কুক্ষিগত করে আগলে রাখতে চেয়েছে। ভয় দেখিয়ে, লোভ দেখিয়ে, প্রাচুর্য ও সুখের লালসায় ডুবিয়ে এক অদ্ভুত যন্ত্রণার আরকে ওকে ডুবিয়ে রেখেছে বাবি। অবশেষে নতুন এক দেবদূত হয়ে সম্রাট সেন এসে দেখা দিয়েছে ওর জীবনে। প্রথম দিন সম্রাট ওকে যে দুজন গুণ্ডার হাত থেকে বাঁচিয়েছিল, মোনালিসার স্থির বিশ্বাস, তারা ওকে আক্রমণ করেছিল বাবির নির্দেশে। মোনালিসার বাড়াবাড়ি যেন সীমাহীন না হয়ে যায়, সেই উদ্দেশ্য। আর বাবির পরিকল্পনাতেই মোনালিসা পায়ে হেঁটে সদর ষ্ট্রীট দিয়ে রওয়ানা হয়েছিল।

সম্রাটকে পেয়ে মোনালিসার নতুন স্বপ্ন দেখা নতুন করে শুরু হল, কিন্তু বাবি যে এখনও ওকে গ্রাস করে চলেছে নিয়মিত ভাবে। কবে সম্রাট এসে সেই অন্ধকারের দুর্গ চুরমার করে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে তার মোনালিসাকে? এসব শোনার পর সে আসবে তো?

'....সম্রাট, তোমাকে সব বলতে পেরে ভীষণ ভাল লাগছে..' অনেকক্ষণ আগেই কান্নায় বিকৃত হয়ে গেছে মোনালিসার কণ্ঠস্বর। সুর-তাল লয় ছন্দ সব কেটে গেছে, 'জানি না, তুমি আর কখনও আমার সামনে আসবে কি না-ভালবাসবে কি না আগের মতো। এখন তাহলে আসি? ঘুমিয়ে পড়, লক্ষ্মীটি! কাল ভোরে উঠে যেন আমার কথাই তোমার সবার আগে মনে পড়ে, কেমন?'

যন্ত্রনিহিত কণ্ঠস্বর শেষ হল। আমি বসে রইলাম আরও বহুক্ষণ। যদি তখন ওকে বাড়িতে ফিরতে না দিতাম? যদি নিয়ে যেতাম আমার কাছে? চিরকালের মতো? তাহলে ও–

কল্পনায় যে সমাধান সহজে পাওয়া যায় বাস্তবে সে সুদূরপরাহত। সুতরাং সোফা ছেড়ে উঠে টেপরেকর্ডার বন্ধ করে ক্যাসেটটা খুলে পকেটে রাখলাম। তারপর কি ভেবে এগিয়ে গেলাম টেলিফোনের কাছে। রিসিভার তুলে লালবাজারে ডায়াল করলাম। বললাম, 'হ্যালো, আমি একটা খুনের খবর দিতে চাই......'

'নাম বলুন। কোত্থেকে বলছেন?' ওপ্রান্ত থেকে ক্লান্ত গতানুগতিক স্বর শোনা গেল।

'নাম জেনে লাভ নেই।' আমি বললাম, শুধু খুনের খবরটা লিখে নিন। মোনালিসা চৌধুরী নামে একটি মেয়ে......'

.....ওর ফ্ল্যাট ছেড়ে যখন বেরিয়ে এলাম, তখন দেওয়াল ঘড়িতে রাত বারোটার সংকেত আধ ঘন্টার ওপর পুরোন হয়ে গেছে।

দশ ☐ আকাশ পাতাল রোড

বিস্ময় ও অনুশোচনা বাবির মুখের চামড়ার পরতে পরতে। মুন্নি নেই। এতদিনের সহচরী এক মুহূর্তের অপমান ও উত্তেজনার বশে বাবির জীবন থেকে লুপ্ত হয়ে গেল। শুধু রয়ে গেল ধারাবাহিক শরীর সুখের স্মৃতি। কিন্তু আশঙ্কা ও আতঙ্ক বাবির ভাবনায় যে সামান্য স্থান পায় নি, তা নয়। পুলিশ। তদন্ত। ফাঁসি। কিংবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। কেউ কি এতক্ষণে আবিষ্কার করে ফেলেছে মুন্নির মৃতদেহ?

মসৃণ বাঁক নিয়ে লোহার গেট পেরিয়ে বাড়িতে ঢুকে পড়ল সবুজ অ্যাম্বাসাডার। গাড়ির পেছনের একমাত্র টেল লাইটটি যেন বলতে চাইছে, দ্যাখো, আমি একা।

অবশেষে গতানুগতিক ক্রিয়াযোগ সহকারে গাড়িটা থামল। ততক্ষণে বাবি সিদ্ধান্ত নিয়েছে মোনালিসার ফ্ল্যাটে টেলিফোন করার।

বাইরের ঘরে পা ফেলতেই কানে এল অস্ফুট গুনগুন ঘুম পাড়ানি গানের কলি : আয় ঘুম যায় ঘুম......। নন্দিতা গাইছে। স্বাভাবিক ভাবেই পাপুর প্রয়োজনে। সন্তর্পণে টেলিফোন তুলে নিয়ে ঠোঁটস্থ নম্বরটা ডায়াল করল বাবি। শুরু হল তার থমথমে প্রতীক্ষা।

ও প্রান্তে কেউ টেলিফোন তুলে বলে উঠল, 'হ্যালো, কে?'

কে?' কে তুমি? সদ্য গতিশীল ট্রেনের মতো হৃৎপিণ্ডের দৌড় শুরু হয়। শ্বাস-প্রশ্বাস ঘন হয়। তারপর টেলিফোন নামিয়ে রাখে বাবি।

শোবার ঘরে পা রাখতেই যেন অদৃশ্য কোন কাচের দেওয়ালে প্রতিহত হয়ে থমকাল বাবি।

ঘরে উজ্জ্বল আলো যথেষ্ট উদার। বিছানায় সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে শুয়ে পাপু। মুখে পুপসি বোতল। দুধ খাচ্ছে। আর আধো ঘুম আধো জাগরণের একটানা 'উ— উ' শব্দ বেরিয়ে আসছে ওর অস্বাভাবিক ঠোঁট চিরে। ওর শরীরের ওপর ঝুঁকে রয়েছে নন্দিতা। নিজে বসে আছে, ইনভ্যালিড চেয়ারে। বাবির পায়ের শব্দে মুখ ফেরালো। বলল, 'দ্যাখো না, গায়ে চাদর রাখতে চাইছে না। বলছে, গরম লাগছে।' পাপুকে দেখিয়ে অনুযোগ করল নন্দিতা।

বাবির শরীরটা কুঁকড়ে গেল পাপুকে দেখে। আর তখনই নন্দিতা একটা চাপা আর্তনাদ করে উঠল। কারণ বাবির চেহারা ও প্রথমে লক্ষ্য করে নি। এখন করছে। সুতরাং কোটের ফাঁক দিয়ে জামায় লেগে থাকা রক্তের ছিটেগুলো যে ও দেখতে পেয়েছে, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই।

নন্দিতার উৎকট সাজগোজে প্রসাধিত মুখমণ্ডল বিশ্রী দেখালো। ও চাপা চিৎকারে বলে উঠল, 'কি হয়েছে? কি করে এসেছ তুমি?'

বাবি কান্না বিকৃত মুখে ওর কাছে এগিয়ে গেল। হাঁটু গেড়ে বসল। ওর কোলে মুখ গুঁজলো। জড়ানো গলায় বলল, 'আমি ওকে খুন করে ফেলেছি। আমি ওকে শেষ করে দিয়েছি, নন্দিতা।'

নন্দিতা যেন নির্লিপ্ত পাথর হয়ে গেল পলকে। ঠাণ্ডা গলায় বলল 'কেন, কি করেছিল মেয়েটা?' একটা চাপা মর্ষকামী আনন্দ কি ঢেউ তুলছে নন্দিতার বুকের ভেতরে?

'ও, ও, আমাকে ঠকিয়েছে। অন্য একটা ছেলেকে ও ভালবাসে। ভালবাসতো।'

বাবির পিঠে আশ্বাসের হাত রাখল নন্দিতা। বলল সহজ স্বরে, 'ঠিকই করেছ। যারা অবিশ্বাসী অকৃতজ্ঞ হয়, তাদের চেয়ে ঘেন্নার লোক আর হয় না। তুমি কোন অন্যায় করো নি, বাবি।'

এমন সময় হঠাৎই চিৎকার করে কেঁদে উঠল পাপু। চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ার চেষ্টায় ঘুরে গেল ওর তেরো বছরের শরীরটা। ও অভিব্যক্তিহীন দুটি চোখ খুলে তাকাল। যথাক্রমে দেখল বাবা ও মায়ের দিকে। তারপর মাকে উদ্দেশ করে বলল, 'মামণি, আমাকে আদর করো।'

বাবি চমকে মুখ তুলে দেখল ছেলেকে। মস্তিষ্কের কোষ থেকে বিজাতীয় বিদ্বেষী তরঙ্গ সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে প্রবাহী বিদ্যুতের মতো। বাবি লক্ষ্য করল, তেরো বছর বয়েসটা তার ছেলেকে বুদ্ধির দিক দিয়ে না পারলেও শরীরের দিক থেকে ঠেলে নিয়ে চলেছে যৌবনের দিকে।

যৌবন বুঝি সর্বকালেই এমন অনিবার্য। এবং অমোঘ।

এগারো ☐ মিশন রো

যান্ত্রিক যুগের যান্ত্রিকতার সঙ্গে হাত মিলিয়ে উদাসীন পৃথিবী আবার স্বাভাবিক। মোনালিসা চৌধুরী নামে কোন যুবতীর অস্তিত্বহীনতা কোন রকম ছাপই ফেলতে পারে নি সেই পৃথিবীর বুকে। এ-বি-সি প্রোটেকশনও তার ব্যতিক্রম নয়। কারণ মোনালিসা চৌধুরীকে রক্ষা করতে মাসোহারায় চুক্তিবদ্ধ ছিল না এ-বি-সি। তাই জ্বালা-ধরা চোখ নিয়ে অফিসে এসে সুসজ্জিতা নমিতা বাসুকে দেখি আমি। দেখি পানাসক্ত সত্যনাথ চক্রবর্তীর টুকটুকে ঠোঁট। এবং কর্নেল বটব্যালের ভীমপলশ্রী চুরুট। শোভা পাচ্ছে তাঁর রাজসিক ঠোঁটে।

গতকাল আমি অফ-ডিউটি ছিলাম। সুতরাং আমাকে দেখে রোজকার মতো সিবি বললেন না, 'ও-কে?' আমার অবিন্যস্ত বেশবাসের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে রইলেন।

আমি নিজের সিটে গিয়ে বসলাম শান্তভাবে। ভেতরের আলোড়ন কাউকে বুঝতে দিতে চাইলাম না। গতকালের ঘটনা স্মরণে থাকায় সত্যনাথও কোনরকম আলোচনার অবতারণা করলেন না।

বিলাস পাকড়াশি ও অবিনাশ দত্ত মনমোহন বোসের সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত ছিল। কথা শেষ করে অবিনাশ দত্ত উঠে এল আমার কাছে। বলল, 'সেন, আজ তোমাকে লালবাজারে একবার যেতে হবে।'

'সময় নেই।' তৎক্ষণাৎ স্পর্ধিত উত্তর দিয়েছি আমি।

দত্ত খানিকটা থতমত খেয়ে গেছে সেই অপ্রত্যাশিত উত্তরে। কিছুক্ষণ নীরবে আমাকে পর্যবেক্ষণ করল ও। তারপর ধীর স্বরে বলল, 'সে তোমার যা ইচ্ছে।' একটু থেমে আবার যোগ করল, 'কেন, কোন রাজ-কাজে যাচ্ছ বুঝি?'

আমি সটান চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। আস্থাশীল পদক্ষেপে এগিয়ে গেলাম আর-আর সেকশানের দিকে।

ইপ্সিত জায়গায় পৌঁছে দেখি, যার খোঁজে আমি এসেছি সে নিরীহ ভঙ্গিতে উপস্থিত : কাপড়ের হাতল বিশিষ্ট আমার প্রিয় লোহার রড। ওটা তুলে নিলাম ডান হাতে। ফিরে এলাম নিজের টেবিলে।

অবিনাশ দত্ত তখন নৃপতি বোসের সঙ্গে আগামী ঘোড়দৌড় নিয়ে কথা বলছিল, আমি তার পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। বাঁ হাতে টোকা দিলাম পিঠে। নৃপতি বোস অবাক হল। সেই সঙ্গে অফিসে উপস্থিত আর সবাই। এবং অবিনাশ দত্ত

ঘুরে তাকাল।

লোহার রড হাতে আমাকে নিশ্চয়ই খুব বিশ্রী দেখায়। তার ওপর এস-আই সম্রাট সেনের কুখ্যাতি যোগ করলে ব্যাপার স্যাপার অনেক বেশি কুৎসিত হয়ে ওঠে। এখনও তাই হল।

আমি খুব শান্ত অচঞ্চল গলায় বললাম, 'দত্ত, আজ সত্যিই আমার রাজকাজ আছে।' আর হাতের লোহার রডটা ইশারায় দেখালাম, 'এই হচ্ছে আমার রাজদণ্ড। একটা কথা আপনাকে জানিয়ে রাখি, গত কয়েকদিন ধরে সস্তার ফাজলামি আমার ঠিক বরদাস্ত হচ্ছে না।'

অবিনাশ দত্তের প্রতিটি পেশী তৈরি হল। শক্তির অবরুদ্ধ তরঙ্গ খেলে গেল পেশী থেকে পেশীতে। আমি জানি, অন্য সময় হলে, অন্য কেউ হলে, ও হয়তো তার সামনের পাটির সব ক'টা দাঁত নামিয়ে দিত বীভৎস ঘুষিতে। কিন্তু এখন ও কিছুই করবে না। শুধু নিজেকে প্রাণপণে সংযত করে ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে যাবে। কারণ ও জানে, ঘুষি সমেত হাত সামান্যতমও তোলামাত্র আমি ওর মাথা চুরমার করে দেব।

কয়েকটা উৎকণ্ঠাময় বিপজ্জনক মুহূর্ত কেটে গেল। অবিনাশ দত্ত চেষ্টা করে হাসল। জড়ানো স্বরে অস্পষ্টভাবে কি একটা বলে চলে গেল নিজের টেবিলে। আমি চেয়ারে বসলাম গা এলিয়ে। অনুভব করলাম পকেটে মোনালিসার ছবি ও কণ্ঠস্বর আমাকে খোঁচা দিচ্ছে।

মিনিট দশেক পর একটা ছুটির দরখাস্ত লিখে টেবিলে পেপারওয়েট চাপা দিয়ে রাখলাম। তারপর অসংখ্য বিস্মিত চোখের সামনে লোহার রডটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেলাম অফিস ছেড়ে। যাওয়ার সময় নমিতা আস্তে করে ডাকল আমাকে। থমকে দাঁড়ালাম।

'মিষ্টার সেন, ব্যক্তিগত ব্যাপার জানি, কিন্তু তবুও বলছি, টেক কেয়ার।'

আমি হাসলাম। বললাম, 'নমিতা, তুমি খুব ভাল। তোমাকে মাঝে মাঝে ভীষণ ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। আই লাইক য়ু।'

ও অভিবাদন গ্রহণের স্মিত হাসি হাসল। আমি নিস্ক্রান্ত হলাম প্রতিহাসি উপহার দিয়ে। এখন আমাকে ডানাকাটা পরীর সন্ধানে বেরোতে হবে। কলকাতা শহরের বুক থেকে তাকে আমি খুঁজে বের করবই।

১৯৩০ সালে তৈরি একটা প্রাচীন বাগান বাড়ি। এবং তার ছাদে স্থাপিত দেবশিশুর বাঁ দিকের ডানাটির মাথা কিছুটা ভাঙা। এরকম বাড়ি সচরাচর চোখে পড়ার নয়। সুতরাং খুঁজে আমাকে বের করতেই হবে। কারণ এটাই হল মোনালিসার মৃত্যুর একমাত্র সূত্র। ভালবাসা ও কর্তব্যের আকর্ষণীয় জালে আমি যে ওর আত্মার কাছে দায়বদ্ধ!

প্রভু দেবশিশু, তুমি দর্শন দিয়া আমাকে করুণা কর! আমার অন্ধকারাচ্ছন্ন যাত্রাপথ আলোকিত হউক তোমার আশীর্বাদে।

বারো ☐ ধর্মতলা স্ট্রীট

ডানা কাটা দেবদূতকে খুঁজে পেলাম তৃতীয় দিন সন্ধ্যায়।

পড়ন্ত সূর্যের আলো তখন মিলিয়ে গেছে। লাল গোলাপের অসংখ্য পাপড়ি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে সারা পশ্চিম আকাশে। দুর্লব পুষ্পবৃষ্টি চেতনা আচ্ছন্নকারী হয়ে ওঠে এই সময়টায়। সুতরাং আচ্ছন্ন অবস্থাতেই অতি ধীরে ধর্মতলা ষ্ট্রীট ধরে মৌলালির মোড়ের দিকে এগিয়ে চলেছিলাম। রক্তাক্ত পটভূমিতে দেবশিশুর ভাঙা ডানাটা কালো গভীর ছায়া হয়ে ধরা দিল হঠাৎই।

গাড়ি থামিয়ে ফেলেছি আমি। নেমে পড়েছি গাড়ি থেকে। অবাক চোখে দেখতে শুরু করলাম আকাশের দিকে তুলে ধরা ডানা দুটো। ডান দিকেরটা অক্ষত, বাঁ দিকের ডানাটি সামান্য ভাঙা। মোনালিসার ছবিটা পকেট থেকে বের করে নিলাম।

বিশেষ বাড়িটা অনুসন্ধানের জন্য মিশন রো'র এক মোটর গ্যারেজ থেকে একটা সাদা ফিয়াট সেই দিনই ভাড়া নিয়ে ফেলেছি। কারণ আমি জানতাম, আমার এই ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কর্নেল বটব্যাল কোম্পানির গাড়ি ব্যবহার করতে দেবেন না। আর দিলেও সেটা অন্যায় হত। সুতরাং রোজ আড়াইশো টাকা হিসেবে লাগাতার সাত দিনের জন্য ভাড়া নিয়ে ফেলেছি গাড়িটা। আর আমার ছুটির দরখাস্তও সাত দিনের। প্রত্যাশা ছিল, সাত দিনের মধ্যে সেই বাড়িটা আমি খুঁজে পাব। মাত্র তিন দিনেই পেয়েছি।

ভোর ছ'টায় বেরিয়ে পড়তাম গাড়ি নিয়ে। চক্রবৎ ঘুরে বেড়াতাম কলকাতা শহরের আনাচে-কানাচে, অলি-গলি, রাজপথে। বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দাদের কাছে দরবার করেছি। বাড়িটার বর্ণনা দিয়ে হদিস জানতে চেয়েছি। শ্রমে শ্রমে ক্লান্ত করে ফেলেছি চোখ দুটোকে। এ যেন মোনালিসার প্রতি কোন অনুচ্চারিত অঙ্গীকারবদ্ধতা। দুপুরের খাওয়া সেরে নিয়েছি হোটেলে। তারপর আবার শুরু। সন্ধ্যায় আঁধারের স্পর্শে সমাপ্ত হয় সেই দিশেহারা ভ্রমণ। তখন ক্লান্ত শরীরে আমি গাড়ি নিয়ে ফিরে চলি বাড়ির দিকে, আর গাড়ির পেছনের সীটে শুয়ে থাকা লোহার রডটা নীরবে আমাকে প্রশ্ন করে, সম্রাট, আজও পেলে না? আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলি, না রে, আজও পেলাম না।

আজ এই কাল্পনিক ব্রাহ্মমুহূর্তে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আবিষ্টের মতো চেয়ে আছি

বিশাল বাগান বাড়িটার দিকে। মনে হচ্ছে, গঙ্গাস্নানের পর পূত পবিত্র আমি প্রশান্ত হৃদয়ে এসে দাঁড়িয়েছি কোন মন্দিরের দরজায়। মন্ত্রপাঠ ও পূজাসমাপনে আমি লাভ করব আমার অভীষ্ট বস্তু। মোনালিসার হত্যাকারী।

আমার সামনে বিশাল লোহার গেট। আধখোলা। ভেতরে টানা চলে গেছে সুরকি ঢালা পথ। তার দুপাশে মরসুমী ফুলের বাগান। লোভনীয় ও মনোহরণকারী নিঃসন্দেহে। আবেশ কাটিয়ে রাস্তা পার হয়ে আমি এগিয়ে গেলাম বাড়িটার দিকে। লোহার গেটের কাছে দাঁড়িয়েই ছাদের পাঁচিলে উৎকীর্ণ দেবশিশুর ঠিক নিচে '১৯৩০' লেখাটা আমার নজরে পড়ল। সেই সঙ্গে আরো দেখলাম বাড়ির সাজগোজের পরিপাটি চেহারা।

দরজার সামনে একটা ছোট গাড়িবারান্দা। তার দুপাশে দেওয়ালে গাঁথা তিনটে তিনটে করে ছ'টা জানালা। ঘন নীল পর্দায় ঢাকা সুচারুভাবে। জানালার নিচে ফুলের কেয়ারি। তাতে লাল, হলদে, বেগুণী, সবুজ, নানান ফুল হাসাহাসি করছে। বাগানের সবুজ ঘাসে বিষাদে ছায়া পড়েছে। কারণ আকাশের রঙ এখন ধূসর ইস্পাতের মতো।

আমার গলা বন্ধ হয়ে এল। জিভ বিস্বাদ। অশ্রু বিদ্রোহী। রাস্তা পার হয়ে ফিরে এলাম গাড়ির কাছে। মোনালিসার ছবিটা পকেটে রেখে। প্রতীক্ষায় রইলাম। এত তীব্র সাধনায় খুঁজে পাওয়া পরশপাথরকে আমি অতি সন্তর্পণে ব্যবহার করতে চাই।

প্রতিক্ষায় প্রতিটি পল-অনুপল আমি মোনালিসার কথা ভাবতে লাগলাম। আমাদের প্রথম দেখা, আলাপ, ভালবাসা, ও মোনালিসার নৃশংস মৃত্যু।

এই সব পবিত্র ভাবনার মাঝামাঝি অপবিত্র সবুজ অ্যাম্বাসাডারটা আমার নজরে পড়ল। রাস্তা থেকে বাঁক নিয়ে লোহার গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসায় গাড়ির ডানদিকের একমাত্র টেল লাইটের টকটকে লাল আলোটা যেন দাউদাউ করে জ্বলছে। আর কিছু ঠাহর করা যায় না। গাড়িটা লোহার গেটের কাছে থামল। বার দুয়েক হর্ন বাজালো অধৈর্য ভাবে। একজন দারোয়ান এসে লোহার গেটের দুটো পাল্লাই হাট করে খুলে দিল। অপরাধী অ্যাম্বাসাডার ঢুকে পড়ল বাড়ির ভেতরে। সুরকী ঢালা পথ ধরে রওনা হল বাড়ির দরজা অভিমুখে।

ফিয়াট গাড়ির পেছনের সীট থেকে লোহার রডটা হাতে তুলে নিলাম।

আসন্ন কালবৈশাখীর পূর্বাভাসের মতো চারিদিক কি অদ্ভুত থমথমে। আমার নেও কোন দোলা নেই। সব ঢেউ থেমে গেছে কোন্ অদৃশ্য অস্পৃশ্য প্রাপ্তিতে।

বৃদ্ধের লাঠির মতো লোহার রডটাকে ব্যবহার করে রাস্তা পার হলাম।

দ্বিতীয়বার এসে দাঁড়ালাম লোহার গেটের সামনে। লক্ষ্য করলাম, কাছাকাছি কেউ নেই। এবং ভেতরের বাগান ঢেকে গেছে কালো আঁধারে। শুধু জ্বলজ্বল করছে জানালার পর্দা ও কাচ ভেদ করে ঠিকরে আসা আলোগুলো।

নিঃসাড়ে গেট পেরিয়ে পা দিলাম সুরকীর রাস্তায়। দ্রুত পদক্ষেপে রওয়ানা হলাম বাড়ির দরজা লক্ষ্য করে।

গাড়িবারান্দার নিচে সবুজ অ্যাম্বাসাডারটা ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে। গাড়ির ভেতরে কেউ নেই। থাকার কথাও নয়। অতএব গাড়ি অতিক্রম করে সিঁড়ির ধাপে উঠে বন্ধ দরজার মুখোমুখি দাঁড়ালাম। দরজায় চাপ দিলাম। দরজা বন্ধ।

আমার ধৈর্য ও প্রশান্তি অন্তর্হিত হল নিমেষে। ক্রোধের ধস নামল সহসা। গলার শিরা ফুলিয়ে চিৎকার করে উঠলাম, 'বাবি-ই-ই ই-ই! বাবি ই-ই-ই!' এবং ছমছমে প্রতিধ্বনি জন্ম নিল।

উত্তরে বাগানের দিক থেকে আগের বারে অদেখা দারোয়ানটি এসে উদিত হল। আমি তাকে কাছাকাছি এগিয়ে আসার সময় ও সুযোগ দিলাম। তারপর লোহার রডটা পলকে বসিয়ে দিলাম তার বাঁ কাঁধে। টু শব্দ বেরোল না। শুধু যেন একটা চিনির বস্তা আছড়ে পড়ল মেঝেতে। আমি আবার ফিরে তাকালাম দরজার দিকে। দারোয়ানের শারীরিক অবস্থার হিসেব নিকেশ করার সময় আমার হাতে নেই। এবং বলতে হবে, সময় মতই মনোযোগ দিয়েছি সামনের দরজায়। কারণ সঙ্গে সঙ্গেই সেটা খুলে গেল। এবং দরজায় প্রকাশিত হল অবিনাশ দত্ত। আরও সঠিক ভাবে বলতে গেলে, প্রকাশিত হল ওর দুরন্ত স্বাস্থ্যময় বুকের কপাট।

লোহার রডটা আমার পায়ের সঙ্গে ঘেঁষে থাকায়, সেটা অবিনাশ দত্তের নজরে পড়ে নি। অবশ্য পড়বার কথাও নয়। আর হয়তো সেই কারণে ভীষণ অভদ্র এবং রুক্ষ স্বরে ও বলে উঠল, 'কি চাই, সেন? পরের বাড়িতে এসে কি পাগলামি শুরু করেছ? জানোয়ারের মতো চেঁচাচ্ছ কেন?'

গায়ে ছাই রঙা টেরিকটনের শার্ট। তার ওপর কালো চেক। উদ্ধত স্বাস্থ্য শীতের পোশাক বাহুল্য মনে করে। প্যান্টের রং সাদা। দু'পা ফাঁক করে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে ও দাঁড়িয়ে।

আমি ওর অভদ্রতার উত্তর দিলাম লোহার রড দিয়ে। নিচ থেকে প্রচণ্ড বেগে রডটাকে নিয়ে এলাম সামনে, ওপর দিকে।

লক্ষ্যভেদ হল স্বাভাবিক ভাবেই। অবিনাশ দত্তের উরুসন্ধির সঙ্গে বীভৎস সংঘর্ষ হল লোহার রডটার। ও যন্ত্রণাবিকৃত মুখে ঝুঁকে এল সামনে। দু'হাত ছিটকে গেল আহত স্থানকে আগলাতে। আমি একটানে লোহার রডটা ফেরত নিলাম। ডানপায়ের সবুট লাথি চালিয়ে দিলাম ওর চোয়াড়ে মুখে। এইবার ও কাৎ হয়ে

পড়ল মেঝেতে। এবং আমি বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়লাম।

অবিনাশ দত্ত আবার উঠে দাঁড়াচ্ছিল টলতে টলতে, আমি নির্বিকার ভাবে রডের দ্বিতীয় আঘাত বসিয়ে দিলাম ওর পিঠে। হাড় ভেঙে যাবার বিশ্রী শব্দ হল। কিন্তু আমি নিরুপায়। দত্ত আবার হুমড়ি খেয়ে পড়ল মেঝেতে। দরজাটা বন্ধ করে দিলাম ভেতর থেকে।

মোনালিসার ধ্বনিবদ্ধ ক্যাসেটে বাবির যে পরিচয় পেয়েছি, তাতে অবিনাশ দত্তের বয়েসের সঙ্গে তার হিসেব মেলে না, কিন্তু বাস্তব সব সময়েই কল্পনার চেয়ে বেশি চমকপ্রদ। হয়তো এই চমকিত অবস্থায় থাকার দরুণ ভেতরের কোন ঘর থেকে ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হওয়া তৃতীয় ব্যক্তিকে আমি আবির্ভূত হতে দেখি নি। তার পরনে ডোরাকাটা স্লিপিং স্যুট। মুখে বয়সের ভাঁজ। লোমশ ভুরু। চোখে যন্ত্রণা। চেহারায় পরিপাটি ছাপ। এই মুহূর্তে বিস্ময় সেখানে ক্রমে আধিপত্য বিস্তার করছে।

তাকে আকর্ষণ করে আনার মতো অনেক শব্দময় ঘটনাই ঘটে গেছে বাইরের ঘরে। এবং তার পরনের পোশাক আমাকে পলকে বলে দিয়েছে, আমি একটু আগেই অনুমানে ভুল করেছি। কারণ এই বাড়ির মালিক অবিনাশ দত্ত নয়, আটপৌরে পোশাক পরা এই মহান ব্যক্তি। বাবি।

আমার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। ফুসফুস অবাধ্য হয়ে ভারী হল। গলার ভেতরে একটা লোহার বল ওঠানামা করতে লাগল। আমি অবিশ্বাস ও আগুন দু'চোখের তারায় পরিপূর্ণ করে তাকে দেখতে লাগলাম। কয়েক পা এগিয়ে গেলাম সামনে। পকেট থেকে মোনালিসার জোড়া-দেওয়া ফটোটা বের করে বাঁ হাতে তার হতভম্ব চেহারার দিকে বাড়িয়ে ধরলাম। কান্না চেপে কোন রকমে ফিসফিস করে বললাম, 'বাবি, মিশন ফার্স্ট, মিশন লাস্ট।'

বিস্মিত হাত বাড়িয়ে কর্নেল বটব্যাল মোনালিসার ছবিটা নিলেন। দেখলেন। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'ভেতরে এসো, সেন।'

আমি নির্লিপ্তভাবে তাঁকে অনুসরণ করলাম।

আমরা এসে উপস্থিত হলাম শোবার ঘরে। ছিমছাম অথচ বিলাসী ঘর। অর্থ ও রুচির ছাপ যুগপৎ অস্তিমান। ঘরে কেউ নেই। আমার একটু আগের চেঁচামেচিতে কেউই বিচলিত হয় নি। অথবা সিবি বিচলিত হতে দেন নি। একটা চেয়ার দেখিয়ে উনি বললেন, 'বোসো, সেন—'

আমি বসলাম।

হাতের ফটোটা দেখতে দেখতে বিছানার ওপর বসলেন সিবি। অভিজ্ঞতাসংপৃক্ত চোখে একসময় দেখলেন আমাকে। অস্বস্তি ও দ্বিধার ভাবটা

কাটিয়ে উঠে বলেন, 'সেন, মোনালিসাকে আমি ভালবাসতাম।'

আমি নীরবে মাথা নাড়লাম দ্রুতবেগে। অর্থাৎ, জানি।

'সেন, তুমি আমার ছেলের মতো—' কর্নেল বটব্যালের স্বর স্নেহসিক্ত ধীর-স্থির অচঞ্চল। যেন ভ্রূক্ষেপই নেই, বাইরের ঘরে ও দরজায় দু'দুটো সংজ্ঞাহীন দেহ পড়ে আছে। ফটোটা তাঁর ভোঁতা আঙুলের ফাঁকে আলতো করে ধরা, 'তোমাকে কষ্ট দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। মুন্নিকে আমি ভীষণ ভালাবাসতাম। তোমার চেয়েও অনেক বেশি। ওকে প্রায় এক যুগ ধরে আমি সবকিছু দিয়ে ভালবেসে এসেছি। ওর রূপে আমি মুগ্ধ, গুনেও মুগ্ধ ছিলাম......' চোখদুটো তার দৃষ্টিহীন শূন্য হল, 'আবার ওর অবহেলা এবং ঘৃণা দেখেও মুগ্ধ হয়েছি। তুমি হয়তো সব ইতিহাস জানো না—'

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। এগিয়ে গেলাম কর্নেলের কাছে। বাঁ হাতের এক ঝটকায় মোনালিসাকে ছিনিয়ে নিলাম ওর হাত থেকে। বাঁ হাতে, কারণ আমার ডান হাতে লোহার রডটা একটা জন্মগত প্রত্যঙ্গের মতো স্থায়ী হয়ে গেছে।

ফটোটা পকেটে রাখলাম, এবং বের করে নিলাম মোনালিসার শেষ কথার চিহ্নবাহী ক্যাসেটটা। আমার চোখ চার পাশে চকিত তাকিয়ে একটা টেপরেকর্ডার খুঁজল।

'ওটা কি, সেন?'

আমি সিবির প্রশ্ন শুনতে পাইনি। তখনও টেপরেকর্ডার খুঁজে চলেছি.

শোবার ঘরে না পেয়ে চলে এলাম বসবার ঘরে। কর্নেল বিছানা ছেড়ে উঠলেন না।

এবারে আমি রেকর্ডারটা খুঁজে পেলাম। মোনালিসার ক্যাসেট তাতে চাপিয়ে যন্ত্রটা চালু করতে মিনিট খানেকের বেশি লাগল না। এবং সেই অলৌকিক কণ্ঠস্বর শুরু হল :

'সম্রাট, নিশ্চয়ই ঘরে তুমি একা রয়েছো? জানি না, যতটা শক্ত হয়ে ...... '

না, ঘরে আমি একা নেই। অবিনাশ দত্তের সংজ্ঞাহীন দেহ পড়ে রয়েছে আশ্রয়হীন হয়ে। বাবি বসে আছে শ্রুতিপরিধির ভেতরে। তোমার কণ্ঠস্বর ওর মহাতর্পণের মন্ত্র। মহানির্বাণের মন্ত্র।

টেপরেকর্ডারের শব্দ উঁচু গ্রামে তুলে দিয়ে ফিরে এলাম শোবার ঘরে। কর্নেল বটব্যাল একই ভাবে বসে। তবে মোনালিসার কথার সরগমে তাঁর মুখে ধীরে ধীরে এক সূক্ষ্ম যন্ত্রণার পর্দা নেমে আসছে।

আমি আবার চেয়ারে গিয়ে বসলাম। এক ঐতিহাসিক যাদুতে সেই কণ্ঠস্বর আমাদের সম্মোহিত করে রাখল ......

'......ঘুমিয়ে পড়ো, লক্ষ্মীটি। কাল ভোরে উঠে যেন আমার কথাই তোমার সবার আগে মনে পড়ে, কেমন?'

সম্মোহন কাটতে আরো কিছুটা সময় লাগল। তারপর কর্নেল বললেন, 'সেন, মুন্নির সঙ্গে তোমার পরিচয় মাত্র কয়েক দিনের। যে জিনিসটা তোমাদের মধ্যে তৈরি হয়েছিল, তাকে ভালবাসা বলা যায় না। বরং বলা যায় একটা ক্ষণস্থায়ী আকর্ষণ মাত্র।'

সিবির কণ্ঠস্বর বহুক্ষণ আগেই বাবির মতো হয়ে গেছে। ভারী কর্কশ ও জড়ানো। আমি চুপচাপ শুনতে লাগলাম।

এ যেন এক অগ্নিপরীক্ষা। শত সহস্র স্তোকবাক্য আমাকে প্রতিজ্ঞা থেকে টলাতে পারে কি না। আমার হিংসা স্তিমিত করতে পারে কি না।

'তুমি ওর জন্যে কতটুকু ত্যাগ স্বীকার করেছ, কতটুকু কষ্ট করেছ?' সিবির গলায় তাচ্ছিল্য ও অহঙ্কারের সুর, 'আর আমি? আমি কখনও ভাবতে পারিনি, তোমার মতো একজন সুলভ যুবক মুন্নির কাছে অমন দামী হয়ে উঠতে পারে। আমি ভাবিনি—' নিস্ফল ক্ষোভে বিছানায় একটা ঘুষি মারলেন সিবি। ঠোঁট কামড়ে মাথা নিচু করে হয়তো কান্না চাপতে চাইলেন। তারপর অস্ফুট স্বরে বলে চললেন, 'আমি বুঝিয়েছি, ভয় দেখিয়েছি, কিন্তু কাজ হয় নি। ও অবাধ্য থেকেছে। আমি ওর ভাইকে সর্বস্বান্ত করতে লোক লাগিয়েছি। তুমি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সে কাজে বাধা দিয়েছ। আমি সেটা অনুমান করে অবিনাশ দত্তকে পাঠিয়েছিলাম তোমার ওপর নজর রাখতে। তুমি সেই চোরকে আহত করেছ, দত্ত প্রমাণ লোপ করতে গুলি করেছে তাকে। তোমাকেও রুখতে কম চেষ্টা করিনি আমি। কারণ মোনালিসা যে আমার জীবনে কি, তা তুমি জানো না।' মুখ তুলে উদভ্রান্ত চোখে তাকালেন সিবি, 'তুমি জানো, আমি কি নিয়ে বেঁচে আছি?' বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ালেন। আমার কাছে এগিয়ে এলেন কয়েক পা। আমি শক্ত মুঠোয় লোহার রডটা চেপে ধরে উঠে দাঁড়ালাম চেয়ার ছেড়ে। সিবি বললেন, 'দেখবে এসো।'

আমরা অন্তরবর্তী দ্বিতীয় এক শোবার ঘরে গিয়ে হাজির হলাম। আলো জ্বলছে। ইনভ্যালিড চেয়ারে বসে এক উগ্র আধুনিকা উল বুনছেন, আর ঘরের অন্যপ্রান্তে দম দেওয়া টিনের রেলগাড়ি নিয়ে আকৃষ্ট একটি বছর বারো –তেরোর ছেলে। মাথাটা বীভৎস বড়, ঠোঁটের কোণ থেকে চিরন্তন প্রপাতের মতো লালা গড়িয়ে পড়ছে।

আমাকে দেখে মহিলা এমন দৃষ্টিতে তাকালেন যেন আগেই আমার উপস্থিতি টের পেয়েছেন, কিন্তু এই প্রথম দেখে আশ্বস্ত হলেন। ছেলেটা হাঁ করে তাকাল, বলল জড়ানো কচি স্বরে, 'কে বাপি, এতা কে?'

কর্নেল বটব্যাল কোন উত্তর দিলেন না। জ্ঞানশূন্য হয়ে প্রায় ছুটে গেলেন মহিলার কাছে। তাঁর পায়ের কাছে শাড়িটা মুঠো করে দলা পাকিয়ে আমাকে দেখালেন। কান্না-ভাঙা গলায় হাসলেন, বললেন,'আমার বউ। জীবনে-মরণে সহধর্মিনী, সেন। যখন ওর এই অ্যাক্সিডেন্ট হয়, তখন ওই হাবা হাফ-উইট ছেলেটা—' অদ্ভুত কিশোরটিকে দেখালেন সিবি, '— নন্দিতার পেটের ভেতর ছিল। কিন্তু ঈশ্বরের এমনই পরিহাস যে মা-ও মরল না, ছেলেও মরল না। বেঁচে রইল। আর সেই সঙ্গে আমাকে করে দিল জীবন্মৃত।'

তেতো হাসলেন কর্নেল বটব্যাল, 'শুনে নাটক মনে হলেও সব সত্যি সেন, সব সত্যি। নন্দিতা আর পাপুর ভাঙাচোরা তছনছ জীবনে আমিই একমাত্র অবলম্বন। সেইজন্যেই মুন্নিকে হারিয়ে সব দুঃখ কষ্ট সইতে হচ্ছে আমাকে— শুধু বেঁচে থাকার তাগিদে। সামান্য উত্তেজনায় এক মুহূর্তের ভুল....' হঠাৎই থামলেন সিবি। একটা বড় দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

এমন সময় মহিলাটি চিৎকার করে উঠলেন তীব্র স্বরে। প্রাচীন বাগানবাড়ি কেঁপে উঠল। কিন্তু আমি এতটুকুও বিচলিত হলাম না। বুঝলাম, আমার হাতের লোহার রডটা উনি এইমাত্র দেখতে পেয়েছেন।

নিজেকে সামলে নিয়ে সিবি বললেন, 'নন্দিতা, নিজের কাজ করো। এ আমাদের দুজনের ব্যাপার—' আমার দিকে ঈশারা করলেন কর্নেল।

ঘর ছেড়ে আমরা আবার ফিরে এলাম আগের জায়গায়।

'সেন, একে কী জীবন বলে? নন্দিতা আজ তেরো বছর ধরে পঙ্গু। ওই অ্যাক্সিডেন্টে ওর দুটো পা-ই কাটা গেছে....' বাবির কণ্ঠস্বর বিস্বাদ হয়ে আসে। মুখের ভেতর থুতু জমে গিয়ে জড়ানো স্বর আরও জড়ানো হয়ে যায়, 'আর পাপু? পাপুকে কি মানুষ বলা যায়, সেন? এরপর —এরপর যদি আমি মুন্নিকে আঁকড়ে ধরে বাঁচাতে চাই, তাহলে কি অন্যায় হবে বলো? কি পাপ করেছি আমি?'

বুঝতে পারছি, ক্রমশ আমার প্রতিজ্ঞা দ্রবীভূত হচ্ছে। মন শিথিল হচ্ছে আবেগ সিঞ্চনে। কর্নেল বটব্যাল ধীরে ধীরে উন্মুক্ত করে চলেছেন নিজের পরিত্রাণের দরজা। সুতরাং আমি প্রাণপণে ভাবতে শুরু করলাম মোনালিসার কথা।

কর্নেলের চাউনি অবিনাশ দত্তের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে ওর উপস্থিতি আমাকে জানিয়ে দিল। আমি একই সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠলাম, ঘুরে দাঁড়ালাম এবং রড চালালাম সজোরে।

আঘাতটা লাগল অবিনাশ দত্তের হাতে ধরা চেয়ারে যেটা ও অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার জন্য অবলীলায় তুলে এনেছে। এবং হাজির হয়েছে শোবার ঘরের দরজায়।

মানুষের জীবনীশক্তি যে সময়ে সময়ে কিংবদন্তীসুলভ হয় তার প্রমাণ পেলাম দত্তকে দু'পায়ের ওপর খাড়া দেখে। এবং একই সঙ্গে আমার দ্রবীভূত প্রতিজ্ঞা আবার জমাট বাঁধল।

রডের আঘাতে চেয়ারের কাঠে ফাটল ধরল। সিবি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'দত্ত, থামো! কি হচ্ছে!'

কিন্তু অবিনাশ দত্ত থামল না। আবার চেয়ার তুলল, এবং পলকে রড ঘুরিয়ে আমি ওর কোমরে বসিয়ে। ও চেয়ার সমেত বেঁকে গেল। তারপর বাবির চোখের সামনে আমি ওর স্বাস্থ্য চৌচির করতে শুরু করলাম। ওর ছাই রঙা শার্টের কালো চেকের পাশে লাল চেকের জন্ম হল। সাদা প্যান্ট লাল হল। চাপ দাড়ি জমাট বাঁধল রক্তাক্ত হয়ে। কে বলে অবিনাশ দত্তের বিনাশ নেই!

আমি স্থির হলাম একসময়। মাথার চুল আমার কপালে রিফিউজি হয়ে বাসা বেঁধেছে। আমি হাপরের মতো শব্দ করে হাঁপাচ্ছি। লোহার রড দু হাতের শক্ত মুঠোয় ধরা। গায়ের জামাটা দু'বগলের কাছে ছিঁড়ে গেছে।

'সেন, সেন!' ডেকে উঠলেন সিবি, 'তুমি কি ওকে খুন করে ফেলবে? করছ কি?'

আমি খুব শান্তভাবে তাঁর দিকে ঘুরে তাকালাম। নিস্পাপ হাসলাম। সিবি বুঝলেন, আমি নিজের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠেছি। সিবি আমার কাছে আবার বাবি হয়ে গেছে।

আমি কোন কথা না বলে অবিনাশ দত্তকে ডিঙিয়ে ফিরে গেলাম বসবার ঘরে। টেপরেকর্ডারের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে রেকর্ডার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ক্যাসেটের টেপ ফুরিয়ে যেতেই। টেপটা রিওয়াইণ্ড করে আবার চালু করলাম বোতাম টিপে। গমগম করে উঠল স্বপ্নময় কণ্ঠ :

'সম্রাট, নিশ্চয়ই ঘরে তুমি..... '

আমি সিবির কাছে ফিরে এলাম। লোহার রডটা অনুভব করে অবাধ্য ভঙ্গিতে দাঁড়ালাম তাঁর সামনে। আমরা আবার মন্ত্রমুগ্ধ মোনালিসার জীবনকাহিনীতে। আমার চোখ অশ্রুময়। সিবি হয়তো ভাবলেন, আমি আবার শিথিল হচ্ছি। তবুও নিজের পরিণতির আতঙ্কে কান্না ভাঙা গলায় বললেন,'সেন, তোমার মনে কি এক বৃদ্ধের জন্যে কোন দয়া নেই?'

সত্যিই সিবিকে এখন জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ মনে হচ্ছে। আমি ঝটকা মেরে ঘনঘন মাথা নাড়ালাম এপাশ-ওপাশ। না, নেই। মোনালিসা তো দয়া পায় নি।

'সেন, আমার পঙ্গু স্ত্রী। অসুস্থ ছেলে। আমি..... আমিই ওদের একমাত্র অবলম্বন।' সিবির কথা হোঁচট খেয়ে যাচ্ছে বারবার, 'আমাকে ছাড়া ওদের জীবন,

ভবিষ্যৎ, আশ্রয় কিছু নেই। ওদের—ওদের জন্যে কি তোমার মনে কোন করুণা নেই? সেন, বলো—'

আমি ঝটকা মেরে ঘনঘন মাথা নাড়ালাম এপাশ-ওপাশ। না, নেই। মোনালিসা তো করুণা পায় নি।

'সেন, তুমি আমার ছেলের মতো। তোমাকে আমি ভালবাসি। নন্দিতা, পাপু— ওরা তো তোমার কাছে কোন অন্যায় করেনি।'

সিবির দেহ অবরুদ্ধ কম্পনে তরঙ্গিত, 'তাছাড়া, একটা সামান্য মেয়ের জন্যে তুমি এতখানি নিষ্ঠুর হতে পারো না। তোমার তো মায়া-মমতা স্নেহ বলে কিছু আছে-'

আমি ঝটকা মেরে ঘনঘন মাথা নাড়ালাম এপাশ-ওপাশ। না, নেই। মোনালিসা তো মায়া মমতা স্নেহ পায় নি।

'সেন, মুন্নিকে আমি অনেক বেশি ভালবাসতাম। ওর মৃত্যু আমাকে কম যন্ত্রণা দেয়নি। অনুশোচনা ও অপরাধবোধে আমার মন ক্ষত বিক্ষত। ছিন্নভিন্ন। আমি প্রতিটি মুহূর্তে আমার অন্যায়ের শাস্তি পাচ্ছি। আমি-আমাকে-' কান্না বিস্ফোরিত হল কর্নেলের চোখে মুখে-দেহে, 'আমাকে-আমাকে তুমি ক্ষমা করতে পারো না? সেন, প্লীজ—'

আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছে। লোহার বল দামাল শিশুর মতো খেলা করছে শ্বাসনালীতে।

মোনালিসার সুরেলা মিষ্টি কণ্ঠ তখনও কথা বলে চলেছে। ও যেন এই পরিবেশে সশরীরে উপস্থিত। এবং এই নাটকের দর্শক।

আমার সত্তা দ্বিধাবিভক্ত। একদিকে মানবিকতা, বিবেক। আর অন্যদিকে প্রতিশোধ ও প্রতিজ্ঞা।

আমি বাঁ হাতের পিঠ দিয়ে চোখ মুছলাম। জোরে শ্বাস নিতে চাইলাম বুকভরে। তারপর ঝটকা মেরে ঘনঘন মাথা নাড়ালাম এপাশ ওপাশ। কোন রকমে কান্না ও দুঃখ মেশানো গলায় উচ্চারণ করলাম, 'না, ক্ষমা নেই। মোনালিসাকে কেউ ক্ষমা করেনি বাবি।'

বিছানায় বসে দু'হাতে দুপাশে ভর দিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদছেন সিবি। কিন্তু আমি কান পেতে মোনালিসাকে শুনছি। আর একই সঙ্গে চোখ দিয়ে লোহার রডটা দৈর্ঘ মেপে নিলাম। আরও মেপে নিলাম আমার কাছ থেকে সিবির দূরত্ব। হিসেব করে দেখলাম, আমাকে আরও একপা এগিয়ে যেতে হবে তাঁর দিকে।

আবার চোখের জল মুছে নিলাম। মোনালিসার ধারাবিবরণী শেষ হওয়ার অপেক্ষায় রইলাম।

এক সময় হঠাৎই একটা শব্দ পেয়ে ফিরে তাকিয়ে দেখি, ঘরের অন্য দরজায় পাপু ও নন্দিতা এসে উপস্থিত হয়েছে। নিস্পলকে তাকিয়ে আছে আমার লাল চোখের দিকে। হাতের লালচে রঙের দিকে। অবিনাশ দত্তের ধ্বংসস্তুপের দিকে।

দুজনেই নির্বাক। হয়তো পরিবেশ ও পরিস্থিতিই তার জন্যে দায়ী।

আমার মনে পড়ল জুনির কথা। এই অবস্থায় আমাকে দেখলে কি ভাবত ও? সেন্টিমেন্টাল যুবনেতা?

একই সঙ্গে তুলনামুলক বিচারের মতো মনে পড়ল মোনালিসার কথা। ও কি ভাবত এখন আমাকে দেখলে? দেবদূত?

'……ঘুমিয়ে পড়ো, লক্ষ্মীটি। কাল ভোরে উঠে যেন আমার কথাই তোমার সবার আগে মনে পড়ে, কেমন?'

তর্পণের মন্ত্র শেষ হল। ক্ষমা নেই, মায়া-মমতা স্নেহ নেই, করুণা নেই, দয়া নেই। শুধু প্রতিজ্ঞা বেঁচে আছে। প্রতিশোধ আছে।

মোনালিসা, আমি নিজে হাতে তোমার সব রক্ত মুছে দেব। ছিন্নভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জোড়া দিয়ে তোমাকে আবার প্রতিষ্ঠা করব এক অনন্ত শিল্পকলায়। হতভাগ্য দর্শক যে শিল্পকলায় সম্মোহিত হয়। মগ্ন হয়। বিলীন হয়।

নতুন করে আমার ও সিবির দূরত্ব আবার মেপে নিলাম এবং জ্বালধরা চোখ নিয়ে অবশিষ্ট এক'পা এগিয়ে গেলাম তাঁর দিকে। প্রমাণিত হল, আমার হিসেবে কোন ভুল ছিল না। কারণ ভয়ঙ্কর সংঘর্ষের কুৎসিত শব্দে ঘরে উপস্থিত সকলেই শিউরে উঠল।